পথের দিশা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী—সরস্বতী

উৎসর্গ

স্নেহের পাত্র

৺হৃদয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

দুঃখময় স্মৃতিতে

এই পুস্তকখানি

উৎসর্গ করিলাম।

পথের দিশা

এক

"গৌরী, গৌরী

রাত্রি তখন দুপুর, বোধ হয় দেড়টা হইবে, চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ; একটানা সাঁ সাঁ শব্দে রাত্রির গান চলিতেছে। খানিক আগে কয়েকটা শৃগাল পথে গৃহস্থের ঘরের পাশে খুব খানিক চীৎকার করিয়া লোককে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল, এখন আবার সমস্ত পল্লীবক্ষ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

আকাশ নিবিড় কালো মেঘে ছাওয়া। বাতাস লাগিয়া সেই ঘন মেঘগুলো সরিয়া যাইতে কদাচিৎ এক আধটা তারা ফুটিয়া উঠিতে উঠিতে আবার মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকিতেছিল। মেঘগুলো সারা আকাশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একস্থানেই জমাট

বাঁধিয়া নাই, এই একটী দুইটী তারার দীপ্তিই তাহা প্রমাণ করিতেছিল।

মাঝে মাঝে কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের রেখা আকাশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া যাইতেছিল, ঘুমন্ত গ্রামখানা সেই শুভ্র আলোকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। রূপ-কথার দৈত্য যেমন সোনারকাঠি স্পর্শ করাইয়া রাজকন্যাসহ সমস্ত রাজপুরীটাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল, রাত্রি তেমনই করিয়া গ্রামখানিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। এই দুর্য্যোগময়ী ভীষণ রাত্রিতে গৌরীর রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া অজিত ডাকিতেছিল—গৌরী, গৌরী!

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, মাঝে মাঝে রুদ্ধ হইয়া যাইতে-ছিল। নিস্তব্ধ রাত্রির সেই একটানা সা সা শব্দের মধ্যে তাহার এই ব্যগ্র ব্যাকুল আহ্বান বড় বিশদৃশ, বড় ভীষণ শুনাইতেছিল, নিজের কণ্ঠস্বরে ভয় পাইয়া সে নিজেই চুপ করিয়া যাইতেছিল।

ঘরের উপরেই আম্র গাছের যে ডালটা নুইয়া পড়িয়াছিল তাহার উপরে একটী পেচক বসিয়াছিল। খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত সে গম্ভীর কণ্ঠে বিধাতার চরণে নিজের ও তাঁহার বিচার সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ জানাইয়া, তাহার গভীর দুঃখে এতটুকু মাত্র সান্ত্বনা না পাইয়া চুপচাপ বসিয়াছিল; মানুষের চীৎকারে তাহার নীরব জ্ঞান ভাঙ্গিয়া গেল, দারুণ বিরক্ত হইয়া অস্পষ্ট-স্বরে কি বলিয়া সে উড়িয়া গেল।

অজিত তাহার পাখার ঝটপট স্বরে চমকাইয়া উঠিয়া থামিয়া

গেল, খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "গৌরী, একবার ওঠো ; - গৌরী,

ভিতরের ঘরে গৌরী ঘুমাইতেছিল। এই খানিক আগে সে অজিতের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্রান্তভাবে কেবল মাত্র সে ঘুমাইয়াছে, ঘুমটা তাই অত্যন্ত গভীর।

বার বার সেই ব্যগ্র ব্যাকুল আহ্বানে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অন্ধকার ঘরে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ঘুমজড়িত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল "কে - অজিতদা - ?"

অজিত হাঁক ছাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি ; একটীবার চল গৌরী, শীগগীর বার হয়ে এসো, বিশেষ দরকার।"

গৌরী তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা জ্বালিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিকটে কালো অন্ধকারের মধ্যে অজিত দাঁড়াইয়াছিল, গৌরীকে দেখিয়াই আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর একটীবার চল গৌরী, স্বলতা আর বাঁচবে না, সে কিরকম করছে ?"

গৌরী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "সে কি,—এই তো দেখে এলুম বেশ কথা বলছে ; এরই মধ্যে এত খারাপ হয়ে গেল—"

বলিতে বলিতে সে নামিয়া গেল, এখন যে মিথ্যা প্রশ্নোত্তরের সময় নয় সেই কথাটী মনে করিয়া হাতের আলোটা মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া সে দরজা বন্ধ করিল, ত্যক্ত আলোটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "চল দেখি।"

সুমুখ ফিরিয়া দুই পা চলিয়া অজিতের মনে পড়িল গৌরী দরজায় চাবি দিল না, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দরজায় শুধু

শেকল দিয়ে চললে—চাবি দিলে না? ঘরে জিনিষপত্র রইল, এই রাত্রি যদি কেউ নিয়ে যায়—"

গৌরী একটু হাসিয়া বলিল, "কেউ নেবে না দাদা, আমার ঘরে কি-ই বা আছে যা লোকে নেবে? সবাই জানে আমার ঘরে দুখানা ছেঁড়া কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই, সেই কাপড়ের লোভে এই দুর্য্যোগে, গভীর রাত্রে কষ্ট করে আমার দরজায় কেউ আসবে না।

অজিত আর কথা বলিল না, কেবলমাত্র "এসো—" অস্ফুটে এই কথাটী মাত্র বলিয়া সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেল, গৌরীর হাতে আলো ছিল, কিন্তু সে আলোর আবশ্যকতা তাহার তখন ছিল না। বাড়ীতে রোগিণীর যে অবস্থা সে দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতে ধীরে চলিবার বা এক মিনিট দাঁড়াইবার ধৈর্য্য তাহার ছিল না।

পথে নামিয়া গৌরী অজিতকে আর দেখিতে পাইল না, সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের খানিক আলোকে পথ দেখিয়া সে পথের উপর দিয়া ছুটিয়াছে, গৌরী তাহার নাগাল ধরিতে পারে নাই।

যথাসাধ্য দ্রুতপদে গৌরী যখন অজিতের বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। পথে আসিতে এই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতেই গৌরীর কাপড়খানা বেশ ভিজিয়া উঠিয়াছিল। হাতের আলোটা এতক্ষণ অনেক চেষ্টায় সে বাঁচাইয়া আনিয়াছিল, দরজার সামনে আসিতে জলে ভেজা দমকা একটা

বাতাসের ঢেউতে সেটা একবার ধ্ ধ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া গেল।

সদর দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া গৌরী অনুভব করিল অন্ধকার বারাণ্ডায় আরও জমাটবাঁধা অন্ধকাররূপে কে যেন বসিয়া আছে। গৌরী ভয় পাইল, মুহূর্ত্তমাত্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে বসে কে ?"

আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর আসিল—"আমি—"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া গৌরী বলিল "বেশ লোক তো তুমি,—অমন ভাবে দারুণ অন্ধকারে দৌড়ে এসে এখানে চুপটী করে বসে রয়েছ অজিত দা ? ঘরে চল, বৃষ্টি এলো ।

অজিত আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আমি আগেই ঘরে যেতে পারব না গৌরী, তুমি গিয়ে দেখ কেমন আছে, বেঁচে আছে কি না,—তারপরে আমি যাব।"

গৌরী বুঝিল তাহার দুর্ব্বলতা কোথায়,—সে ধমক দিয়া বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি অজিত দা, ঘরে চল বলছি। তুমি তো আচ্ছা ভীরু লোক, এই সাহস নিয়ে ডাক্তারী পড়লে কি করে ? অদৃষ্টে যা ঘটবার তা ঘটবেই, তাই ভেবে দশ দিন আগে থাকতে যে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হয় এ রকম কথা কখনও শুনি নি, কাউকে তোমার মত অধীর হতেও দেখি নি। তুমি যদি ওরকম কর, আমি কক্ষনো ওঘরে যাব না, এখনই বাড়ী ফিরে যাব, ওঠো বলছি।"

তাহার ধমকে অজিত উঠিল, কিন্তু ঘরে গেল না

বলিল, "তুমি এগিয়ে গিয়ে দেখ আগে কি হয়েছে তারপর আমি যাব।"

গৌরী রাগ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

রোগিণী স্নেহলতা একখানা তক্তাপোষে বিছানার উপর শুইয়া আছে, মাথার কাছে পুরাতন দাসী নিতাইয়ের মা বসিয়া বাতাস করিতেছে। গৃহের এক কোণে একটী আলো মৃদুভাবে জ্বলিতেছে। গৌরী প্রবেশ করিতেই নিতাইয়ের মা মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যে, গৌরী মা এসেছ, আমি বাঁচলুম। বাবু এসেছে?

গৌরী উত্তর না দিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া রোগিণীর নিকটে লইয়া গেল, ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ দেখিল, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করিল, তাহার পর আশ্বস্ত ভাবে আলো কমাইয়া সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "হ্যাঁ অজিত দা ফিরেছে। এই তো বউদি বেশ ভালোই রয়েছে, বেশ ঘুমাচ্ছে। আগে কি হয়েছিল বল দেখিঅজিত দা, অমন পাগলের মত এই রাত্রে আমায় ডাকতে গিয়েছিল কেন?"

নিতাঁইয়ের মা উত্তর দিল, "তেমন কিছুই হয় নি, কথা বল্‌তে বল্‌তে বউ মা হঠাৎ কি রকম হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তাতেই বাবু ভয় পেয়ে গেল। আমি বল্‌লুম তোমায় ডেকে আনি, বাবু কি তা শোনে,—বলে তুমি আসবে না, সেই জন্যে নিজেই ডাকতে ছুটল।"

কথাবার্ত্তার শব্দে রোগিণীর তন্দ্রাভাব দূর হইয়া গিয়াছিল,

গৌরীকে দেখিয়া তাহার মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের উপর মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে ইঙ্গিতে তাহাকে কাছে বসিতে বলিল।

নিকটে বসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ললাটে স্নেহপূর্ণ হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল বউদি ?"

সুলতা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "কিছু হয় নি দিদি, উনি কাঁদছিলেন তাই আমার বুকের ভেতরটা কি রকম করে উঠেছিল—"

গৌরী মাথা দুলাইয়া বলিল, "বুঝেছি, দাদার কান্না দেখে, তোমার বুকে ভারি যন্ত্রণা হয়েছিল, সেই জন্যেই এত কাণ্ড ঘটে গেল।"

দরজার উপর দণ্ডায়মান অজিতের মুখের উপর রোস কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, "যা বারণ করেছি, ঠিক তাই ঘটল। তোমায় হাজার বার না বারণ করেছি অজিত দা তুমি একটু শক্ত হও,—কিন্তু তুমি যদি একটী কথা শোন, তুমি যদি তবু শক্ত হতে পারো। আমি এখানে তখনই থাকতে চাইলুম, তুমি জোর করে আমায় বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে, সে কেবল এই কাণ্ডটাই ঘটাবার জন্যই নয় কি ? তুমি ডাক্তার, কোথায় রোগীকে আশা ভরসা দেবে, তা নয়, আরও কেঁদে কেটে রোগীকে দুর্ব্বল করে তুলছো। তোমার মত লোককে রোগীর কাছে থাকতে দিলে রোগীর যা সেবা হবে তা বোঝাই যাচ্ছে। না বাপু, তোমার কথা আর আমি শুনছি নে, বউদি ভালো না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আর কোথাও যাচ্ছিনে, তা এতে যে যাই

বলুক। তোমায় আর এদিকে আসতে হবে না, দিন দুবার বড় জোর তিনবার ডাক্তার হিসাবে শুধু রোগী দেখো, সেবা যা করেছ ওই ঢের হয়েছে—আর দরকার নেই। এখন যাও, নিজের ঘরে গিয়ে শোওগে, যদি দরকার পড়ে ডাকব।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া অজিত চলিয়া গেল। গৌরী নিতাইয়ের মায়ের হাত হইতে পাখা লইয়া বলিল, "তুমি খানিকটা ঘুমিয়ে নাও বাছা, আমি এখানে বসে আছি।

ঔষধের শিশিগুলো রোগিণীর মাথার কাছে একটি টুলের উপর ছিল, পরীক্ষা করিয়া গৌরী দেখিল এখনও দুইবার ঔষধ খাওয়ান হয় নাই। গৌরী বেশ বুঝিল প্রথমবার ঔষধ খাওয়ানোর সময়েই এই কাণ্ডটা ঘটিয়া গেছে।

সে মাথা নাড়িয়া আপন মনেই বলিল, নাঃ অজিত দা পরের অসুখ হলে চিকিৎসা করতে পারে, সেবাও করতে পারে, নিজের কারও অসুখ হলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। এরকম লোককে দিয়ে রোগীর সেবা চলবে না।

রোগীণীর মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া অল্পে অল্পে তাহার বড় বড় চোখ দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দুই

গৌরী তরুণী বিধবা, সংসারে আপনার বলিতে একমাত্র কাকা ছাড়া আর কেহই নাই।

খুব ছোট বয়সেই গৌরীর পিতামাতা মারা যান, সে কথা আজ গৌরীর মনেও পড়ে না। পিতা তাহার জন্য কি রাখিয়া গিয়াছেন, অনেকদিন পর্য্যন্ত সে তাহার কিছুই জানিত না।

পিতা মাতা মারা যাওয়ার পরে সে কাকা ও কাকিমার গলগ্রহ হয়, এবং তাঁহারাই সে দশ বৎসরে পড়িবামাত্র তাহার বিবাহ দেন।

গ্রামের লোকে বলে কাকা ও কাকিমার মতলব নাকি ভালো ছিল না, নচেৎ সুন্দরী গৌরীর উপযুক্ত এত ছেলে দেশেই থাকিতে তাহারা দূরদেশে বজবজে পাত্র খুঁজিতে গেলেন কেন এবং প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসরের একটী বৃদ্ধকেই বা গৌরীর স্বামী নির্ব্বাচন করিলেন কেন?

বৃদ্ধ জগন্নাথ চৌধুরীর অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। তাঁহার উপযুক্ত তিনটী পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং দৌহিত্র

দৌহিত্রী অনেকগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও তিনি এই দশ বৎসরের মেয়েটীকে বাকি কয়টা দিনের জন্য সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার বিবাহের কথা বাড়ীতে কেহ জানিতে পারেন নাই, জানিলে পুত্র কন্যাগণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন। "কলিকাতায় যাইতেছি বলিয়া কাহাকেও সঙ্গীমাত্র না লইয়া তিনি একাই কল্যাণপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। কাকা রামগতি বিবাহের জন্য পুরোহিত পণ্ডিত প্রভৃতি ঠিক করিয়া দিয়া গোপনে তাঁহার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা লইয়া তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন।

ইহার পর নাতনী সদৃশা বধূটীকে লইয়া জগন্নাথ চৌধুরী যখন দেশে ফিরিলেন তখন তাঁহার অবস্থা কি হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। আপদ বিদায় হইল এবং পাড়ার লোকেও তাহার হইয়া দুচার কথা শুনাইতে আসিবে না মনে করিয়া রামগতি প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও আবার নূতন উৎসাহে ঘর সংসারের এবং ব্যবসার কাজে মন দিলেন।

কিন্তু আপদ দূর হইয়াও হইল না, কিছুকাল বাদে একদিন সিঁথীর সিঁদুর মুছিয়া, হাতের শাঁখা লোহা ঘুচাইয়া শুভ্র থান পরিহিতা গৌরী কাকার কাছেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাকা একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, "কিরে,—চলে এলি যে?"

তখনও হয়তো তাহার সজ্জার দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, মানুষটার উপস্থিতিই চোখে পড়িয়াছিল মাত্র।

তরুণী গৌরী শান্তভাবেই উত্তর দিল, "খুসি হল, চলে এলুম।"

কাকা তাহার সজ্জার পানে তাকাইলেন, ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "তুই ভারি বোকা মেয়ে গৌরী, তাই চলে এলি, তুই যে বিধবা হলি সে কথা কেবল আমি কেন, সবাই জানত, তাই বলে তুই যে চলে আসবি তাতো কেউ কোনদিন ভাবি নি। তুই চলে এলি কেন বল দেখি, তোর বিষয়ের বন্ধুরা যে মারা গেল। এ রকম হয়েছে আমায় একটা খবর দিলি নে কেন, চুল চিরে বিষয় ভাগ করে নিতুম যে।"

গৌরী গম্ভীর মুখে বলিল, "বিধবা মানুষ, বিষয় সম্পত্তি, টাকা-কড়ি নিয়ে কি করব কাকা? ভারি তো একবেলা দুটো করে ভাত, পরণের দু খানা থান—একি কোথাও মিলবে না?"

কাকা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, খানিকক্ষণ তিনি মোটে কথা বলিতে পারিলেন না, তাহার পর বলিলেন, "তবু মানুষের সময় অসময় আছে তো, সেই জন্যেই টাকাকড়ির দরকার হয়। গায়ের সেই ভারি ভারি গয়না গুলোর কি করলি, সেগুলো এনেছিস তো?"

গৌরী উদাসভাবে বলিল, "পরতেই যখন পাবনা এককাঁড়ি সোনা নিয়ে কি করব? সেই জন্যে সেগুলোও ছেলে বউদের দিয়ে দিয়েছি, তারা তবু পরবে।"

কাকা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "সত্যিই তাই,—না তারা জোর করে নিয়েছে সেই কথাটাই শুধু বল, আমি তাদের একবার দেখে নেই।"

গৌরী একটু হাসিয়া বলিল, "বাঃ, তারা কি কেড়ে নিতে পারে? ওদেরই গয়না তো,—তারা দিয়েছিল—তাদেরই দিয়ে এলুম।"

কাকা পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওকেই আর কি,—তাদের দয়া করে আমার মাথা কিনে নিয়েছিল—না গৌরী? বলি—সেই যে একবেলা করে খাওয়া আর বছরে প্রায় আটখানা কাপড়, দুখানা গামছা এ সব জুটচে কোথা থেকে—তোকে দেবে কে, সে মহাত্মার নামটা শুনি।"

গৌরী দমিল না, তেমনই শান্ত কণ্ঠে বলিল, "কেন, তুমি দেবে।"

"আমি দেব—? আমায় ভারি বড়লোক দেখেছিস কিনা, তাই আমার কাছে আজ যাবজ্জীবনের খোরাক পোষাক আদায় করতে এসেছিস? নিজের জিনিস পরকে বিলিয়ে দিয়ে এসে এখন পরের ধনে পোদ্দারী করবি বই কি—"

কাকা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

গৌরী সে হুঙ্কারে ভয় পাইল না, বলিল, "আমি পরের ধনে পোদ্দারী করতে আসিনি, কারও কাছে ভিক্ষে চাইতেও আসিনি, আমার হক টাকা আমি দাবি করতে এসেছি। আমি জানি আমার বাবা আমার জন্যে অনেক কিছুই রেখে গেছেন, তুমি সে সব দখল করে বসে আছ। আমি নগদ কিছু না চাইলেও আমার খোরপোষ তা হতে আদায় করবই কাকা।"

জোঁকের মুখে লবণ দিলে সে কেমন ভাবে উদ্যত মস্তক

গুটাইয়া এতটুকুটি হইয়া যায়, রামগতির অবস্থা ঠিক তেমনই হইয়া উঠিল, তিনি আর একটী কথাও বলিতে পারিলেন না।

তিনি ভাবিতেছিলেন—এতটুকু মেয়ে গৌরী এত কথা শিখিল কেমন করিয়া? বৃদ্ধ জগন্নাথের উপর কাকার দারুণ আক্রোশ জাগিয়া উঠিল,—গৌরীকে সে আর কিছুই দিয়া যায় নাই, এই কয়টা বৎসরে কেবল কতকগুলো কথাই শিখাইয়া গিয়াছে।

ইহার পরে দুই তিন বৎসর গৌরী জোর করিয়া এই সংসারেই রহিয়া গেল। একা সে ভূতের মত খাটিত, কাকা ও কাকিমার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিত। ইহাতে তাহার দুঃখ ছিল না, হয় তো এই ভাবেই সে তাহার জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিত যদি না মাঝখানে কাকিমার মা আসিয়া পড়িতেন। তিনি এখানে আসিয়াই সংসারের কর্ত্রী হইয়া বসিলেন, তখনই তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

নিত্য ঝগড়া বিবাদ, মাথা ফাটাফাটি, রামগতি আর সহ্য করিতে পারেন না। অথচ আশ্চর্য্য এই কান্নাকাটি, মাথা খোঁড়া চীৎকার সব এক পক্ষেই চলে, অপর পক্ষে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে থাকে। গৌরী ঝগড়া করে কিন্তু মাত্রা লঙ্ঘণ করে না। কোন দিন সে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নাই, কাহারও কাছে নালিশ করে নাই; রাগ করিয়া অনাহারে থাকে নাই বা নিজের

কাজে শৈথিল্য পর্য্যন্ত দেখায় নাই, ঝগড়ার সময় ইহাদের দৌর্ব্বল্য—রোদন, মাথা ভাঙ্গা দেখিয়া সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে হাসে,—যেন কিছুই হয় নাই এমন ভাব দেখাইয়া গা দুলাইয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। অপর পক্ষের গা জ্বলে, শেষটায় ভগবানকেই ডাকিতে হয়।

অবশেষে রামগতির স্ত্রী স্বামীর কাছে কাঁদিয়া পড়িল—সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। সে স্পষ্ট কথা জানাইল এরূপ ভাবে এ সংসারে সে বাস করিতে পারিবে না। হয় গৌরীকে তফাৎ করিয়া দেওয়া হোক, নয় তাহাকে মায়ের সহিত যাদবপুর তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক।

প্রথমোক্ত কাজটা তত কঠিন নয়, দ্বিতীয় প্রস্তাবে রাজি হওয়াই বড় কঠিন।

গৌরী নিজেই তফাৎ হইল কিন্তু কাকার বাড়ী সে আর রহিল না। দক্ষিণ পাড়ায় গৌরীর পিতার নিজের বাড়ীতে গ্রামের জিতু ময়রা অনেককাল হইতে ভাড়াটিয়া হিসাবে বাস করিতেছিল, মাসে মাসে বাড়ীতে বাস করার ভাড়া হিসাবে রামগতিকে দুই টাকা করিয়া দিতে হইত।

দীর্ঘ উনিশ বৎসর পরে গৌরী রোখের বশে পিতার এই বাড়ীতেই চলিয়া আসিল এবং জিতুকে ভিতরের অংশটা বিনা ভাড়ায় যাবজ্জীবন বাস করিবার অনুমতি দিয়া সে বাহিরের দিককার দুইটি ঘর দখল করিয়া বসিল। পাড়ার পাঁচজন লোক হিতৈষীভাবে আসিয়া তাহার পিতার সম্পত্তি নালিশ করিয়া

আদায় করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু ঝগড়াটে মেয়েটি ততদূর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কাকা স্বেচ্ছায় তাহাকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সে তাহাতেই সম্মত হইল।

তিন

অজিত গৌরীর ছোটবেলাকার অজিত দা; গৌরীর চেয়ে কয়েক বৎসরের বড়। ও পাড়ায় কাকার বাড়ীর পাশেই তাহাদের বাড়ী, কাজেই দিনরাত অজিতদার বাড়ীতেই তাহার স্থান ছিল। ছেলেবেলায় এই মেয়েটী ছিল অজিতের একমাত্র সঙ্গিনী। অজিতের সমস্ত ফরমাস সে হাসিমুখে পূর্ণ করিয়া যাইত এবং অজিত যত দোষই করুক, গৌরী তাহা দোষ বলিয়া ধরিত না।

কতদিন সে গৌরীকে মারিয়াছে, তাড়াইয়া দিয়াছে, গৌরী

সে কষ্ট গায়ে মাখে নাই, আবার ফিরিয়া অজিতের কাছে গিয়াছে।

বিবাহের পরে স্বামীর আলয়ে গিয়া এখানকার আর কোন স্মৃতি তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই যেমনভাবে অজিত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত যাইবার সময় সে একমাত্র অজিতদার জন্যই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল,—আর কাহারও জন্য তাহার মন কেমন করে নাই।

পনের বৎসর বয়সে গ্রামে ফিরিয়াই সে অজিতের বাড়ী ছুটিয়াছিল, হর্ষোৎফুল্ল মুখে জানাইল তাহার স্বামী মরিয়া গিয়াছে, আর তাহাকে বজবজে যাইতে হইবে না, সে বাঁচিয়া গিয়াছে। বুড়ো যদি বাঁচিয়া থাকিত, গৌরী আর দেশে ফিরিতে পাইত না, চিরকাল তাহাকে ওখানেই থাকিতে হইত।

অজিত তখন কুড়ি একুশ বৎসরের যুবক তখন সে ভালোমন্দ বুঝিতে শিখিয়াছে, সে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসে।

গৌরীর কথা শুনিয়া সে অন্ধকারপূর্ণ মুখে বলিয়াছিল—"বুঝতে পারছ না গৌরী, তোমার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে; কিন্তু আজ না বুঝলেও একদিন বুঝতে পারবে। একদিন বুঝবে কতখানি অকাজ করেছ— সেদিন তোমায় অনুতাপ করতেই হবে। এখনও যদি ভালো মনে কর—তুমি ওখানে চলে যাও, ওখানেই থাকো গিয়ে, এখানে এ রকমভাবে থেকো না।"

কথা শুনিয়া গৌরী মোটেই খুসি হইতে পারিল না। সেই-দিনে হঠাৎ যেন সে বুঝিয়া ফেলিয়াছিল কেবলমাত্র, একজনেরই পরিবর্ত্তন হয় নাই, সমস্ত গ্রাম খানারই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দারুন বেদনায় গৌরীর বড় বড় দুইটী চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়া-ছিল, সে নিঃশব্দে সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছিল।

একদিনের কথা মনে পড়ে—

সেদিন অজিত অনেক ছেলের সহিত নদীর কালো জলে সাঁতার দিতেছিল, গৌরীও সেই সময় জল আনিতে ঘাটে গিয়া-ছিল। নদীর জলের মধ্যে পাটা শেওলা জন্মিয়াছিল, তাহাতে অজিতের পা জড়াইয়া যাওয়ায় সে বিপন্ন হইয়া সঙ্গী ছেলেদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। ছেলেরা নিজেদের জীবনের আশঙ্কা করিয়া অজিতের দিকেও যায় নাই! দূর হইতে অজিতকে মুক্ত হইবার জন্য নানাবিধ উপায় বলিয়া দিতেছিল। যে অজিত ইদানীং গৌরীকে এড়াইয়া চলে, সামনাসামনি হইলেও কথা বলে না, তাহারই জীবনরক্ষার জন্য গৌরী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং লোকের নিন্দাভয় তুচ্ছ করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। নিজের জীবনের ভয় সে করে নাই, কাহারও পানে সে চায় নাই, অসীম সাহসে ভর করিয়া সে অজিতকে সেই নিশিতে মৃত্যুর হাত হইতে টানিয়া আনিয়াছিল।

অন্য ছেলেরা এ জন্য অজিতকে তীব্র বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না; তাহারা স্পষ্টই বলিল, গৌরী না থাকিলে অজিতকে ডুবিয়া মরিতে হইত, অতএব গৌরীর পদধূলা মাথায় করিয়া তাহার ক্রীত-দাস হইয়া থাকাই এখন অজিতের উচিত।

তাহাদের বিদ্রূপে শান্ত প্রকৃতি অজিতও অকস্মাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অতগুলি ছেলের সম্মুখে গৌরীর পৃষ্ঠে একটা কীল বসাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল "আমি না হয় ডুবেই মরতুম তুই কেন তাড়াতাড়ি আমায় বাঁচাতে গেলি হতভাগি? ফের যদি আমি যেখানে যাব বা থাকব, সেখানে কোন দিন যাস, তাহলে আমি তোকে খুন করে ফেলব।"

নির্ব্বাকে জলশূন্য চোখে গৌরী কেবল তাহার পানে তাকাইয়াছিল।

সেদিনকার সেই নিদারুণ অপমান গৌরী আজও ভুলে নাই, আজও সেদিনকার কথা মনে করিতে সে সহসা নিশ্চল হইয়া যায়। সেদিনকার বালিকা গৌরী বাড়ীতে ফিরিয়া সারাদিনটা লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল, বরাবর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল আর কখনও না, অজিত যে দিকে থাকিবে সে দিকে সে আর যাইবে না।

যে প্রতিজ্ঞা সে গভীর নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা—অজিত সসম্মানে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং গ্রামের জমিদার মহাশয় তাঁহার সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা সুলতার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

অজিতের মা এই বিবাহে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, গৌরীও বাদ যায় নাই।

গৌরী খানিক সময় ভাবিয়াছিল সে যাইবে কি না, অনেক ভাবিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল,—এবং দুইগাছি শাঁখা দিয়া অজিতের স্ত্রীর মুখ দেখিয়া আসিল।

সুলতার পিতা গ্রামের জমিদার হইলেও কলিকাতায় বাস করিতেন, কদাচিত গ্রামে আসিতেন। গ্রামকে তিনি বড় ভয় করিতেন, সেই জন্যই জামাতাকে এখানে রাখিতে চান নাই। কিন্তু অজিত ছিল ভারি একগুঁয়ে, সে গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও নড়িতে চাহিল না। শ্বশুরকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল—যাহারা মানুষ হইবে তাহারা সবাই যদি কলিকাতাবাসী হয়, গ্রামে যে সব হতভাগ্যেরা পড়িয়া থাকিবে তাহারা বাঁচিবে কি করিয়া? ইহারা শিক্ষা জানে না, স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে কেহ কোন দিন ইহাদের উপদেশ দেয় নাই, অথচ জমিদারের খাজনা ইহাদের নিয়মিত ভাবে দিয়া যাইতেই হইবে। সে দেশের ছেলের উপযুক্ত কাজ করিবে, যে গ্রামকে শিক্ষিত ভদ্রলোক ঘৃণা করেন, সেই গ্রামের বুকেই সে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র গঠন করিবে।

জমিদার শ্বশুর ক্রুদ্ধ হইলেন বড় কম নয়, জামাতার ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন অজিত যদি তাঁহার উপদেশ মত কাজ না করে, বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত তাহার সংস্রব রাখা চলে না। দেশ নাকি দেশ, কতকগুলো ছোটলোক যাহার অধিবাসী, সেই দেশেরই গর্ব্ব করা চলে না।"

অজিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলিয়াছিল—তারা ছোটলোক স্বীকার করা চলে কিন্তু কাজে তাহারা অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের চেয়েও বড়, —অনেক উঁচু।—

জমীদার জামাতার কথা নীরবে শুনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাকি আর কথা কহিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। শ্বশুর ও জামাতার মাঝখানে একটা দেয়াল গড়িয়া উঠিল এবং তাহা চিরকালের মতই রহিয়া গেল।

সুলতা গ্রামেই রহিয়া গেল।

অজিত তাহার পিত্রালয়ে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু সুলতা তাহাতে রাজি হয় নাই।

ইহার কিছুদিন পর অজিতের মা মারা গেলেন, সেদিন গৌরী গিয়াছিল, তাহার পর আর সে সেবাড়ী যায় নাই।

কিন্তু সেদিন ঘাট হইতে আসিতে স্ত্রীর অসুখের জন্য মহাব্যস্ত অজিতের সহিত হঠাৎ তাহার দেখা হইয়া গেল। অজিত চলিয়া যাইতেছিল, কি মনে করিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, মলিন মুখে দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "শুনলুম তুমি নাকি রোগীর সেবা করতে বড় ভালোবাস গৌরী, আর রোগীও নাকি তোমার হাতের সেবায় বড় আরাম পায়। আমার স্ত্রীর ভারি অসুখ, একটীবার সেখানে যাবে কি? আমি সেবা করতে পারিনে, অথচ এখানে এমন কেউ নেই যার হাতে আমি তার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। বোনকে আনবার ঠিক করলুম, শুনছি তারা নাকি ওয়াল্‌টেয়ার চলে গেছে। তুমি যদি দয়া করে

দিন কতকের জন্যে ওর সেবার ভারটা নাও, সত্যিই আমি ভারি নিশ্চিন্ত হই।" .

এমন সকাতর উক্তি যে উদ্ধত অজিতের মুখ হইতে প্রয়োগ হইতে পারে তাহা গৌরী জানিত না।

সেদিন গৌরী নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া গেল, অজিত তাহাকে কতস্থানে কতরূপে যে অপমান করিয়াছিল সে চিহ্ন তাহার মন হইতে মুছিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল সে অজিতের স্ত্রীর সেবা করিবে; সে বাড়ীতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া অজিতের বাড়ী ছুটিল।

চার

অজিতের প্রাণঢালা স্নেহ, যত্ন, ভালোবাসা ও ব্যগ্রতা, গৌরীর অক্লান্ত সেবা ও যত্ন কিছুই সুলতাকে সে যাত্রা রক্ষা করিতে পারিল না। একদিন মুহ্যমান স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া এপারের হিসাবনিকাশ চুকাইয়া দিয়া সুলতা ওপারের পথে যাত্রা করিল।

স্ত্রীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়া অজিত—মানুষটা যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। এতদিন সে যে ভয় করিতেছিল, প্রতিনিয়ত

যাহার বিয়োগ বেদনা কল্পনা করিয়া সে আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে সেই ভয়াবহ মৃত্যু যখন সত্যই আসিয়া তাহার নিষ্ঠুর স্পর্শে সুলতার দেহখানা শূন্য করিয়া প্রাণ লইয়া চলিয়া গেল, তখন অজিতের ভিতরে চৈতন্য আর ছিল না বলিলেই চলে।

গৌরী আশঙ্কা করিয়াছিল, এ আঘাতে সে পাগলের মত হইয়া যাইবে, মাতৃবিয়োগে যেমন সে ছুটাছুটি করিয়াছিল, তেমনই করিবে, তাহাকে হয়তো ধরিয়া রাখা যাইবে না, কিন্তু সে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল অজিত এ ধাক্কা সামলাইয়া গেল। সে পাষাণ মূত্তির মতই বসিয়া রহিল, তাহার চোখে একটী ফোঁটা জল পর্য্যন্ত আসিল না।

নিজে সে উঠিতে পারিল না, গৌরীকে দিয়াই সুলতার বাক্স হইতে আলতা সিঁদুর বাহির করিয়া লইল এবং স্বহস্তে পত্নীকে মহাযাত্রার সাজে সাজাইয়া দিল, অবশেষে তাহাকে শ্মশানের দিকে খানিক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

গৌরী ভাবিয়াছিল যখন সে শবের সহিত গিয়াছে তখন সে শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ফিরিবে না, কিন্তু মিনিট কুড়ির মধ্যে তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

শুষ্ক একটু করা হাসির রেখা ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটাইয়া তুলিয়া অজিত বলিল, "শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পারব না গৌরী, পাছে দেখতে হয়, এই ভয়ে শ্মশানে পর্য্যন্ত সঙ্গে যাই নি, খানিক দূর 'পর্য্যন্ত

এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি। তার দেহটাকে নিজের হাতে আগুনের মাঝে দিতে পারলুম না,—চোখে দেখা—তাও আমি সহ্য করতে পারব না।"

তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, গৌরী শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "বেশ করেছ অজিত দা, আমি আগেই এ কথাটা বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু তুমি কি ভাববে বলেই বলতে পারি নি। যাক, ওতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না বলেই মনে করি।"

অজিত স্থির নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল "কিন্তু ভশ্চায মশাই বলছিলেন—"

গৌরী বাধা দিয়া বলিল, বুঝেছি, তিনি বলেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তোমায় শ্মশানে থাকতে হবে, নিজের হাতে মুখাগ্নি করতে হবে অবশেষে চিতা ধুয়ে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এ সবাইকে করতে হবে এমন কি কথা আছে অজিত দা,—তোমাকেই যে সব শেষ করতে হবে এ শাস্ত্রের বিধান তিনি দিলে দিতে পারেন, কে পালন করবে তার মনের দিকটা তো তিনি দেখলেন না। ভশ্চায মশাই কেবল বাইরের দিকটাই দেখেছেন। দেখেছেন —বাইরের কতকগুলো নিয়ম, সংস্কার, সেই জন্যে তুমি স্বামী বলেই তোমার হাতে তার শেষ গতির ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়জন লোক এ রকম শক্ত হয়ে শাস্ত্র মেনে কর্ত্তব্য পালন করতে পারে? তুমি মনে কিছু ক'রো না, ওতে বউদির স্বর্গ-প্রাপ্তির এতটুকু ব্যাঘাত হবে না।"

অজিত বোধহয় এই কথাটা ভাবিতে ভাবিতেই অগ্রসর

হইতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন তাহাকেই শেষ কাজ সমাধা করিতে হইবে, ইহাই স্বামীর কর্ত্তব্য। সতীর মনের বাসনা ইহাই, প্রত্যেক নারীই এই ইচ্ছা করে। অজিত দুর্ব্বলতার জন্যই এ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিল না।

সেই মুখখানা—সেই মুখে সে নিজের হাতে আগুন দিবে, দাঁড়াইয়া দেখিবে আগুন কেমন করিয়া লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহার স্থলতার সোণার দেহখানি গ্রাস করিবে, অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিবে তাহারই চিতাভস্ম মাত্র।

না, এ একেবারেই অসম্ভব, এ কথা ভাবিতে গেলেই অন্তর যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। এখনও তাহার মনে হইতেছিল যদি তাহার কোনও ভুল হইয়া থাকে,—যদি কোনও ত্রুটি থাকিয়া গিয়া থাকে।

গৌরীর কথা শুনিয়া ফিরিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বাস্তবিকই তা হলে এতে দোষ হয় নি গৌরী, তার আত্মা এতে কষ্ট পাবে না তো?"

গৌরী একটু হাসিল, বলিল "তাই কি হতে পারে অজিত দা? যে আত্মা চলে গেছে, সে কি আর এ পারের কোন ভুল, কোন ক্রটী ধরতে পারবে? আর সেইটাই তাকে কষ্ট দেবে? আর তুমি তো তাকে কোনদিনই এতটুকু দুঃখ কষ্ট দাও নি যে সেই জন্যে তার মনের মধ্যে ক্ষোভ থেকে যাবে? যতদিন বিয়ে হয়েছিল, ততদিন স্বামীর কর্ত্তব্য তুমি তো নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে এসেছ অজিত দা, তবে ভাবছ কেন?"

অজিত স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে যেন জিজ্ঞাসার সুরেই বলিল, স্বামীর কর্ত্তব্য ঠিকই পালন করেছিলুম, তার মধ্যে সত্যই এতটুকু ভুল ছিল না, ত্রুটী ছিল না ?"

তাহার অন্তরের অন্তরালে নিহিত সত্যে আঘাত লাগিয়াছিল। একটা তারে আঘাত দিলে তার সুরটা যেমন কতক্ষণ রেস রাখিয়া যায়, গৌরীর সেই সামান্য কথা কয়টী অজিতের মনের গোপন একটা তারে আঘাত করিয়া তেমনই একটা বেদনার রেস্ টানিয়া রাখিয়াছিল।

গৌরী তাহার গোপন কথা বুঝিয়াছিল, সে জোর করিয়া বলিল, যে তোমার এতটুকু ভুল হয় নি, এতটুকু ত্রুটী হয় নি, কিন্তু এ কথা মুখ ফুটে কাউকে জিজ্ঞাসা না করে তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করলেই তো এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে অজিত দা, পরে তোমার মনের খবর কতটুকু জানে কে উত্তর দিতে পারবে ?"

অজিত কথা বলিল না কেবল ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল মাত্র। গৌরী স্পষ্টই বুঝিতেছিল কোথাও এতটুকু গলদ আছে, আজ অজিত কিছুতেই সেই গলদটুকুকে ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না।

যে ঘরে সুলতা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, গৌরীর বার বার নিষেধ সত্ত্বেও অজিত সেই ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গৌরী ডাকিল "অজিত দা—"

অজিত চিৎ হইয়া শুইয়া হাতখানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর রাখিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে থাকিয়াই উত্তর দিল, "কি বলছ গৌরী ?"

গৌরী একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজ তবে আমি বাড়ী যাই ?"

অজিত চোখের উপর হইতে হাত সরাইয়া তাহার পানে তাকাইল, তাহার পর উঠিয়া বসিল ; বলিল, "আজই চলে যাবে গৌরী ? একটা রাত অন্ততঃ পক্ষে আজকের রাতটা এখানে—এ বাড়ীতে থেকে যাবে না ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা সকরুণ ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহা শুনিয়া ও মুখের আর্ত্ত করুণ ভাব দেখিয়া গৌরী আর একটী কথা বলিতে সাহস করিল না, অথচ না গেলেও নয়—তাই সে চুপ করিয়া দরজার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

খোলা জানালাপথে ফাল্গুনের বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া ঘরের মধ্যে বহিয়া আসিতেছিল, দূরে কোথায় কে জানে মেঠোস্বরে বাঁশী বাজিতেছিল। বাহির তখন শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোয় ভরিয়া গিয়াছে, জানালার ধারে নারিকেল গাছের বাধা পাইয়া চাঁদের আলো মুক্তভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই, টুকরা টুকরা হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। নিকটেই একটা বাড়ীতে সেদিন বিবাহ ছিল, লোকজনের চীৎকার, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়াটা মাতিয়া উঠিয়াছিল।

অজিত চোখ মুদিয়া ভাবিতেছিল, তাহার জীবনে কবে এমনই

একটা রাত্রি আসিয়াছিল, তাহার পর এমনই সুন্দর আরও কত রাত্রি আসিয়াছে—পাপিয়ার গানে ফুলের গন্ধে সে সব রজনী পূর্ণ হইয়া থাকিলেও সেই প্রথম রাত্রিটীর মত কোনটাই মধুর হইতে পারে নাই। সেটা ছিল বৈশাখ মাস, সেই কথাটাই মনে পরে ;—আকাশে সেদিন কাল বৈশাখীর মেঘ সাজিয়া আসে নাই তাই আকাশ ছিল সুনীল—উজ্জ্বল নক্ষত্রমালায় শোভিত। আজ শেষ ফাল্গুনের সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ যেমন নীলাকাশে ভাসিয়া উঠিয়া সারা ধরার বুকে শুভ্র কিরণ ছড়াইয়া দিতেছে, সেই সুন্দর রাত্রেও এই চাঁদ হাসিয়াছিল। আজ যেমন দূরে কোথায় পাপিয়া ডাকিতেছে, সেই অতীত একটী রাত্রেও এমনই ডাকিয়াছিল। মনে হইতেছে আজ যেন সেই রাত্রিই ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সেদিন ও এদিনের মাঝখানে কি অসীম অনন্ত ব্যবধান। সেদিন সম্মুখে ছিল আলো, আশা, আনন্দ ও উৎসাহ, আজ মনের অন্ধকার সীমা ছাপাইয়া বাহিরের শুভ্র জ্যোৎস্নাকে মলিন করিয়া দিয়াছে, আজ সম্মুখে আশা নাই, আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিতে দৃষ্টি পড়িল জানালার দিকে,—একরাশি জ্যোৎস্না নারিকেল গাছের আড়াল ছাড়িয়া জানালার মধ্য দিয়া আসিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। দরজার পার্শ্বে কে যেন নড়িল, দরজার উপরে স্তিমিত আলোকে তাহার ছায়া দেখা গেল।

"কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?"

গৌরী উত্তর দিল, আমি অজিত দা—"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া অজিত বলিল, "তুমি এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ গৌরী, কোনও দরকার আছে কি ?"

গৌরী জোর করিয়া সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিল, "বলছিলুম আজ বাড়ী না গেলে কাল হয় তো অনেক কথা উঠতে পারে অজিত দা— ।"

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

গৌরী বলিল "এতদিন বউদির অসুখের জন্যে ছিলুম কিন্তু আজ কেন রইলুম এর কৈফিয়ৎ লোকে চাইতেই তখন আমি তাদের কি উত্তর দেব তাই ভাবছি।"

অজিত একটু কঠিন সুরেই বলিল, সে আমারই বলতে ভুল হয়েছিল, তুমি বাড়ী যাও গৌরী। বাস্তবিকই আমি এ দিকটা ভাবি নি, স্বার্থপরের মত কেবল নিজের দিকটাই দেখে গেছি। কিন্তু তুমি একলা যেতে পারবে না গৌরী, নিতাইয়ের মাকে নিচে গিয়ে একটীবার বল, নিতাইকে সে তোমার সঙ্গে দেবে এখন।

দ্বারের বাহিরের আলো একটু নড়িতেই অজিতের মুখের উপর গিয়া পড়িল, গৌরী একবার তাহার মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া বলিল, "থাক, আমি আজ আর যাব না। একটা রাত বই তো নয়, আমি কাল খুব ভোরে উঠে চলে যাব।"

অজিত বলিল "কিন্তু আমার মনে হয়, এতকথা ভেবে— পরিণাম সম্বন্ধে এতখানি সজাগ হয়েও তোমার আজকের রাত এখানে থাকা উচিত নয়।

গৌরী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, ভুল বলেছি অজিত দা, তোমার আজকের অবস্থার পানে না চেয়ে লোকের কথাটাই ভেবেছিলাম।

সে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল, উত্তর দেওয়ার জন্য মাথা তুলিয়া অজিত আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

পাঁচ

পরদিন সকালেই গৌরী বাড়ী চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় বলিয়া গেল, "আমি দুপুরে আবার আসব অজিত দা, তোমার হবিষ্যের যোগাড় আমিই এসে করে দেব এখন।"

শুষ্ক হাসিয়া অজিত বলিল, "না না, সে জন্যে তোমায় আর আসতে হবে না। নিতাইয়ের মা আছে, নিতাই আছে, ওরাই সব ঠিক করে দেবে এখন; যেমন করেই হোক, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমিও যে নেহাৎ অকর্ম্মণ্য নই তা তো তুমি জানো।"

গৌরী হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না।

বিকৃত মুখে সে বলিল, "হাঁা, তুমি যে কত কাজ করতে পারো তা আমার অজানা নেই। সে যাই হোক দেখা যাবে কতদূর কি হয়।"

সে চলিয়া গেল।

আজ কয়টা দিন সে বাড়ী ছাড়া, ঘর উঠান রান্নাণ্ডা সব একাকার হইয়া আছে। বাড়ীতে পৌছিয়া দুখানা ঘর বারান্ডা, উঠান পরিষ্কার করিতেই তাহার বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহার পর বেলা প্রায় এগারটার সময় সে মাথায় একটু তৈল দিয়া একটা কলসী লইয়া নদীতে চলিল।

ফাল্গুন মাস, গঙ্গার দুধারে ইহারই মধ্যে বেশ চড়া পড়িয়া গিয়াছে। গঙ্গা এদিকে কলিকাতার মত প্রশস্ত নহে। বর্ষায় গঙ্গা কূলে কূলে ভরিয়া উঠে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে দেখিয়া চেনা যায় না।

পথ ইহারই মধ্যে গরম হইয়া উঠিয়াছে। মাথায় গামছা খানা দিয়া চলিতে পথে দুই চার জন গ্রামবাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঘাটে গিয়া সে দেখিল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা ভগিনী দাক্ষায়ণী কলসীটা মাজিয়া ঘাটের এক পাশে রাখিয়া কেবল মাত্র গামছাখানা ডুবাইতেছেন। মাথার উপর যে প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ সেদিকে তাঁহার তেমন দৃষ্টি নাই।

ঘাটের একপাশে নাবিয়া কলসী নামাইয়া গৌরী জলে নামিল।

ঘাটের দক্ষিণে একটু দূরে শ্মশান। মাঝে একটা বাগান

ব্যবধান থাকিলেও বাঁকের মুখ বলিয়া স্পষ্টই সব দেখা যায়। শ্মশানের নিকটে একটা গাছে অসংখ্য শকুনী বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে নিজেরা মারামারি করিয়া ঝট্‌পট্‌ ডানার শব্দ করিতেছে, চীৎকার করিয়া আকাশ কম্পিত করিতেছে।

শ্মশানের বুকে একটা চিতা ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, মৃতের আত্মীয় স্বজনগণ মলিন মুখে গাছের ছায়ায় কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়াছিল।

গৌরী কাল দুপুরের কথা ভাবিতেছিল, ইহারই মধ্যে দুইদিন হইয়া গেল। কাল এমন সময় অজিত স্থলতার মাথা কোলে লইয়া বসিয়াছিল, তাহার মুখে চোখে অবর্ণনীয় বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কাল ওই মহাতীর্থের সম্মুখ পর্য্যন্ত সে স্ত্রীর শবদেহের অনুগমন করিয়াছিল তাহার পর একান্ত নিঃস্বের মত চোখের জল ফেলিয়া দুই হাতে আর্ত্তবক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। যাহাকে সত্যকার ভালবাসা যায় তাহাকে স্বহস্তে জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করাইয়া—সেই প্রিয় দেহটীকে দগ্ধ করা—তাও কি মানুষ পারে? যাহারা পারে তাহাদের হৃদয় পাষাণে গড়া।

দাক্ষায়ণী মুখ তুলিয়া একবার তাহার পানে তাকাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজিতের বউটি বুঝি কাল মারা গেল গৌরী?"

অন্যমনস্ক ভাবে গৌরী উত্তর দিল, "হাঁ, কাল মারা গেছে।"

দাক্ষায়ণী গামছা দিয়া মুখ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন, "আহা, অমন বউটি,—রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী যাকে বলে ঠিক

তাই। অমন প্রতিমা কখনও অমন হাড়হাভাতের ঘরে টিঁকতে পারে? সেই জন্যেই রইল না, দুদিন না যেতে মারা গেল।"

কথাটা গৌরীর গায়ে বাজিল, ডুব দিতে ভুলিয়া গিয়া হাতের গামছাখানা কাঁধের উপর ফেলিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাড়হাভাতে কি রকম?"

যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন, "ওমা, হাড়-হাভাতে নয়—তুই বল্‌ছিস কি গৌরী? হাড়হাভাতে আর কাকে বলা চলে—একমাত্র অজিতকে ছাড়া? ওই যে কথায় বলে না—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, অজিত ঠিক তাই করলে কিনা সত্যি করে বল দেখি? অমন যে লক্ষ্মী প্রতিমা বউটি, ওর ঘরে এসে একটা দিনের জন্য সুখের মুখ দেখতে পেয়েছে কোন দিন তাই বল দেখি? তুই তো প্রায়ই ওদের বাড়ী যেতিস, দেখতেও তো পেয়েছিস সব, কোনদিন তাকে ভালো কিছু পরতে দেখেছিস? যার বাপের কুবেরের ঐশ্বর্য্যি, যে মেয়ের পেছনে দশটা ঝি চাকর ঘুরত, যে একটু ঘামালে দশজন লোক ছুটে আসত হাওয়া করতে,—সে কি কষ্টটাই না সয়ে গেল বল? বলি—সে তো আর শোনা কথা নয় বাছা, এই গাঁয়েরই জমীদারের মেয়ে, নিজের চোখে ওদের বাড়ীর হালচাল দেখেছি,—এখনও দেখছি। অমন রাজা শ্বশুর,—তার সঙ্গে ঝগড়া করে বউটাকে জোর করে নিয়ে এসে তাকে কি কষ্টটাই না দিলে? হেন কাজ নেই যা সে সেই রাজার মেয়েকে দিয়ে করায় নি,—কিন্তু ওর কি তা সয়? সে কি কোন দিন রান্নাবান্না করেছে, না ঘরের কাজ কোনদিন করেছে?

সেই মেয়ে ওর সংসারে এসে সব করেছে, বাসন মাজা, জল তোলাও কখনও কখনও করেছে, স্বচক্ষে দেখেছি। এই যে এত বড় ব্যাপারটা হল,—কেন,—ওর বাপকে একটা খবর দিতে পারলে না? না হয় নিজে নাই যেত, বলি—তাদের একটা খবর দিলে তারা কি এসে তাদের মেয়েকে নিয়ে যেত না? ছ্যাঃ ছ্যাঃ, অমন লক্ষ্মী প্রতিমাকে কি না এমন করে বেচিকিৎসায় মেরে ফেল্‌লে গা!"

গৌরী অভিভূতের মত তাঁহার কথা শুনিয়া যাইতেছিল; শেষ কথাটা শুনিয়া সে যেন অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উঠিল, বলিল, "ও-কথাটী বলো না পিসি, অজিতদার নামে ও কলঙ্কটী দিও না, অজিত দা চিকিৎসার কিছু বাকি রাখে নি। নিজে ডাক্তার হলেও চিকিৎসা করে নি, নিত্য পাঁচ ছয়জন ডাক্তার এসে দেখেছে, চিকিৎসা করায় নি এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।"

অজিতের প্রতি গৌরীর এই পক্ষপাত দাক্ষায়ণী বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিলেন, মুখখানা অপ্রসন্ন করিয়া বলিলেন, হতে পারে সে নিজে ডাক্তার, দিনরাত রোগীর কাছে ছিল, কিন্তু সে তো থাকার কথাই বাবু, তারই স্ত্রী তো। সে সেবা করবে না সেবা করতে যাবে কি পাড়ার লোকে না গাঁয়ের লোকে? ওতে বাহাদুরী দেওয়া চলে না বাপু, ওতো ওর করবারই কথা; তবু তার বাপকে একটা খবর দেওয়া কি তার উচিত ছিল না?

পরণের কাপড়খানা জলের মধ্যে ডুবাইয়া দুইহাতে ঘসিতে ঘসিতে গৌরী ভারি স্বরে বলিল, "হয় তো খবর দিয়েছে—"

বাধা দিয়া মুখভঙ্গী করিয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন, "হ্যাঁ দিয়েছে, তুই আর ওর দিক টেনে কথা বলিস নে গৌরী, শুনে হাড় অবধ জলে যায়। খবর দিলে কেউ আর আসত না,—খবরটাও নিত না—তাই তুই বলছিস তো ?"

গৌরী বলিল, "আমার বলার দরকার ? অজিতদাই বা আমার কে আর জমীদার মশাই বা আমার কে ? অজিতদাও আমায় দুদিন খেতে দেবে না, জমীদার বাড়ীতেও কোনদিন আঁচল পেতে দাঁড়াব না, ওদের খবরে আমার দরকারই বা কি ?"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "কেই বা দাঁড়ায় মা—? তবে জমীদার মশাই বামুনের বিধবা বলে মাসে মাসে চার টাকা করে দেন—এইটুকু মাত্র। তা বলে কেউ বল্‌তে পারবে না কোন দিন তাঁর দোরে গিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়িয়েছি কি বলেছি আমায় আরও দুটাকা বেশী দাও।"

গৌরী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কত দিনই দাক্ষায়ণীকে জমীদারবাড়ী দেখা গিয়াছে—কলিকাতা পর্য্যন্ত তিনি গিয়াছেন, সে খবরটা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

দাক্ষায়ণী তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, খানিক থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কাল রাতেও ওবাড়ীতে ছিলি না গৌরী ?"

তাঁহার এই সহজ সরল প্রশ্নটীর ভিতরে বিরাট গুরুত্ব অনুভব করিয়া গৌরী নিমেষে শক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "কয়দিনই যখন

ছিলুম কালও থাকতে হল। আজ এই সকালে বাড়ীতে ফিরেছি মাত্র।"

দাক্ষায়ণী গামছাখানি নিংড়াইতে নিংড়াইতে বলিলেন, "না, অজিত ছেলেটী মন্দ নয় নেহাৎ, কিন্তু ওই যে কেমন একগুঁয়ে স্বভাব বাপু, কারও সঙ্গে এ পর্য্যন্ত ওর মতের মিল হল না। কেউ যদি বলে ডাইনে চল, ও যাবে ঠিক বাঁয়ে, এই তো হচ্ছে ওর চলার ধারা। ওর নেই কি? ভাই, ভাজ, বোন, সবাই তো বর্ত্তমান, তবু কাউকে একটা খবর দিলে না গো। শ্বশুরবাড়ী জাজ্জ্বল্যমান সংসার সবাইকে ছেড়ে এমন ভাবে এখানে ওই ভিটে কামড়ে পড়ে আছে কেন ওর কেউ কোথাও নেই—ও যেন একেবারে একা। বেশ, শ্বশুরকে না হয় নাই খবর দিলি, ভাই কি বোনকে খবর দিতে কি হয়েছিল? বোন তো এই কাছেই আছে, তারা আছে পাবনায়, একটা খবর দিলেই তারা না এসে থাকতে পারত না। আর সে ভাইকেও তো জানি বাছা, সে তো এ কালের ছেলের মত নয়, অমন রামের তুল্য ভাই পাওয়া বড় কম অদৃষ্টের কথা নয়। হ্যাঁ গা, বলি একখানা পোষ্টোকার্ড লিখে দিলে তারা যে সবাই এসে পড়তো, তাই কি জানতে দিলে কাউকে?"

গৌরী ঝুপঝাপ গোটাকতক ডুব দিয়া উঠিয়া এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতেছিল, বলিল, "খবর কি অজিত দা দেয় নি? গাঁয়ের লোকে যখন দেখে কেউ আসে নি—তখন দুটো কথা শুনিয়ে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে ছাড়ে না। তারা যদি সব

খবর রাখত, তবে এ রকম কথা কক্ষনো বলতে পারত না। কমলা পুরী গেছে, খবর পেয়েই সে চলে আসবে, ভাইও সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আসবেন জানিয়েছেন। এতদিন তবু একরকম কেটেছে, তাই বলে আর তো কাটবে না, গাঁয়ের লোকেও কেউ কাজ করে দিতে যাবে না, তবু ও কেন যে তাদের এত মাথাব্যথা তা বুঝতে পারি নে বাপু। শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া অনেক জামাই-য়েরই হয়ে থাকে, এখন করে সারা দেশ তো তাদের [illegible] কথা ছড়িয়ে যায় না বাপু।"

সে জলে ঢেউ দিয়া কলসী ভরিয়া লইল।

দাক্ষায়ণী বিকৃত মুখে বলিলেন, "গাঁয়ের লোকের দোষ তো পদে পদেই বাছা, এখন বলবিই তো। বলি তুই ও তো গাঁ ছাড়া নোস গৌরী—"

গৌরী উঠিতে উঠিতে জবাব দিল,—"নই বটে তাই বলে পরে কোথায় কি করলে তা নিয়ে অতটা বোধ হয় মাথা ঘামাইনে।"

দাক্ষায়ণীর ওষ্ঠাগ্রে কি একটা কথা আসিয়াছিল, সে কথাটা সামলাইয়া লইয়া স্তব্ধ কণ্ঠে বলিলেন "এই তো বললি কারও সঙ্গে তোর সম্পর্ক নেই; তবে অজিতের কথাই বা গায়ে মাখছিস কেন গৌরী? তার নামে একটা কথা বললে তোর বুকে যেন আগুনের জালা জ্বলে ওঠে,—কেন বল দেখি? যার সঙ্গে এতটুকু রক্তের সম্পর্ক নেই তার জন্যে তোর এতটা মাথা ব্যথা দেখে সত্যিই যেন কি রকম বোধ হয়!"

গৌরী পিছন ফিরিয়া চলিতেছিল, মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিল, "ওই তো আমার দোষ পিসিমা,—যা অন্যায় তা আমি কোনদিন সইতে পারি নি, পারবও না, ওই জন্যেই যার কাকার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কারও নামে অন্যায় কিছু বললে আমার গায়ে বাজে, কাজেই জবাব দিতে হয়। তাতে কেউ যদি কিছু মনে করে, তা করুক, ওতে আমি নাচার।"

সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল, পিছনে দাক্ষায়ণী গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহা সে একবার ফিরিয়াও দেখিল না।

ছয়

সমস্ত পথটা সে দ্রুতপদে চলিল, পাশে কে পড়িল না পড়িল সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

বাড়ীতে গিয়া কলসিটা দুম করিয়া বারাণ্ডায় নামাইয়া রাখিয়া কাপড় ছাড়িয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। উনান ধরাইবার জন্য কাঠ দিয়াশলাই প্রভৃতি যোগাড় করিতে করিতে সে ভাবিতেছিল,—দেশের লোকের এত মাথা ব্যথা কেন? অজিতদার যে কতখানি গেল তাহা দেশের লোক বুঝিল কই; সেই ব্যথার স্থানে দুই পা দিয়া মাড়াইয়া তাহারা আরও কি সুখ পাইতে চায়?

এই যে স্থলতা চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল তাহাতে কাহারও তো এতটুকু ক্ষতি হয় নাই; এমন কি তাহারও কিছু হয় নাই, কিন্তু যাহার গেল তাহার ঘর যে একেবারে শূন্য হইয়া গেল, তাহা দেখিল কে, তাহা বুঝিলই বা কে?

স্থলতার পিতা কি কন্যার এই ব্যারামের কথা শুনেন নাই? তিনি এখানকার জমীদার, এখানকার অনেক লোকই তাঁহার মন রক্ষা করিয়া চলে, তাঁহার তোষামোদ করে, ইহাদের মধ্যে কেহই কি স্থলতার ব্যারামের সংবাদ তাঁহাকে দেয় নাই?

নিশ্চয়ই তিনি এ সংবাদ পাইয়াছেন, কিন্তু কেবলমাত্র অজিতের উপর রাগ করিয়াই তিনি একটীবারের জন্য কন্যার খোঁজটাও লন নাই।

যদি সুলতার মা থাকিতেন—

গৌরী সুলতার মুখেই শুনিয়াছে বহুকাল পূর্ব্বে তাহার মা মারা গিয়াছেন। একদিন মায়ের কথা বলিতে বলিতে তাহার মুখখানা বড় মলিন হইয়া উঠিয়াছিল, সে কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, "যার মা নেই তার বাপের বাড়ীর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকে না। থাক না ভাই বোন বাপ একমাত্র মায়ের অভাবে সবই পর হয়ে যায়, কেউ আর খোঁজটাও নেয় না।"

বড় কম দুঃখেই সে এ কথা বলে নাই। তাহার মা নাই সত্য, পিতা আছেন, বড় ভাই আছেন,ছোট একটী বোনও আছে।

আজ অজিতের বিরুদ্ধে লোকে কত কথা বলিবার অবকাশ পাইতেছে, কারণ সুলতা আজ নাই। লোকে তো ইহাই চায়, অপরাধ তাঁহাদের নাই। এতদিন সুলতা থাকিতে মুখ ফুটিয়া তাহারা বিশেষ কোন কথা বলিতে পারে নাই—কেন না সে মাঝখানে থাকিলে কোনদিন না কোনদিন শ্বশুর জামাতায় মিলন হইবেই।

সুলতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোকে জানিয়াছে মাঝখানে যে ব্যবধান রহিল তাহা আর কোনদিনই দূর হইবে না, সেই জন্যই তাহারা আজ এত কথা বলিবার অবকাশ পাইয়াছে।

গৌরীই বা অজিতের পক্ষ লইয়া লোকের সহিত কত ঝগড়া করে? অজিত একটা কথাও বলে নাই, সে যাহা বলে সবই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—তবে গৌরীই বা কথা বলিতে যায় কেন? ইহাতে লোকে কেনই বা তাহাকে দশ-কথা শুনাইয়া দিবে না, নিন্দাই বা করিবে না কেন?

উনানে দুখানা কাঠ দিয়া দরজার পাশটায় বসিয়া গৌরী ভাবিতেছিল, অথচ উনানে যে তখনও আগুন পড়ে নাই, হুঁস তাহার ছিল না। অন্যমনস্কভাবে উনানে কাঠ ঠেলিয়া দিতে গিয়া মনে পড়িল, উনানে আগুন দেওয়া হয় নাই।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে দিয়াশলাই ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে আসিয়া রান্নাঘরের দরজায় সবে সে শিকলটা তুলিয়া দিতেছিল, সেই সময় ময়রা বউ আসিয়া দাঁড়াইল। এমন অসময়ে দরজা বন্ধ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রান্না করলে না দিদিমণি, আবার এই বেলায় দরজা বন্ধ করে চললে কোথায়?"

গৌরী উত্তর দিল, "রান্না পরে হবে এখন, একবার চট করে অজিতদার বাড়ী হতে ঘুরে আসি। তাঁর হবিষ্যের জোগাড় হল কিনা—কেই বা করবে আর—"

ময়রা বউ বলিতে গেল, "এই ঠিক দুপুরে—"

একটু হাসিয়া গৌরী বলিল, "ঠিক দুপুর হল তাতে কি? দুপুরের রোদ আমার গায়ে লাগে না। ময়রা বউ, সব সয়ে গেছে, কষ্ট মনে করলেই কষ্ট, নইলে কিছুই নয়! ঠিক যেন

সাপের বিষ, ওঝা এসে ঝেড়ে দিয়ে বলে—বল্ নেই,—রোগীও সঙ্গে সঙ্গে বলে—নেই, বাস অমনি অমন যে ভয়ানক বিষ তাও চলে যায়।"

হাসিতে হাসিতে সে উঠানে নামিল।

ময়রা বউ বলিল, "কিন্তু তোমার রান্না হবে কখন?"

গৌরী অবহেলার ভাবে বলিল, "বিধবার আবার রান্না আর খাওয়া। যখন হয় একমুঠো চাল ফুটিয়ে নেব এখন, তার সঙ্গেই গোটা দুই আলু সিদ্ধ করে নেব। এক বেলায়ই খাওয়া তো, যখন হয় করব এখন, ওর জন্যে আর তাড়াতাড়ি কি?"

উঠান পার হইয়া সে পথে নামিয়া পড়িল।

ঝোঁকের মুখে খানিকদূর চলিয়া সে হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইল, মনে পড়িয়া গেল, অজিত তাহাকে নিষেধ করিয়াছে। নিষেধ করা সত্ত্বেও সে যখন গিয়া অজিতের বাড়ীতে দাঁড়াইবে তখন অজিত কি ভাবিবে—কি বলিবে?

নিশ্চয়ই বলিবে—অজিতের জন্য গৌরীর এত মাথা-ব্যথার দরকার কি? দাক্ষায়ণীও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন না,—কিন্তু অজিতও যদি বলে?

গৌরী একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল যাওয়া উচিত কিনা।

কিন্তু অজিত হবিষ্যই বা করিবে কি করিয়া? পুরুষ মানুষ একে তো কোন কাজই পারে না—জল আনা, উনান ধরানো এ সব তাহার সাধ্যাতীত কাজ, তাহার উপর অজিত মায়ের অত্যধিক

আদরে মানুষ হইয়াছে, এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত সে কখনও নিজের হাতে লইয়া খায় নাই. সেই মানুষ—সে আজ নিজের হাতে সব যোগাড় করিয়া লইবে কি করিয়া ?

হয়তো উপবাস করিয়াই দিনটা কাটাইয়া দিল, তাহাও তো অসম্ভব নয়। স্থূলতার অসুখের সময়ও নাকি সে মাঝে মাঝে উপবাসে দিন কাটাইয়া দিয়াছে, বাহিরের নিতান্ত অন্তরঙ্গ লোকও জানিতে পারে নাই সে ভাত খায় নাই।

গৌরী আবার চলিতে সুরু করিল।

অজিত যাহাই ভাবুক, যাহাই মুখ ফুটিয়া বলুক, সে নিজের কাজ ঠিক করিয়া যাইবে। যাহা সে সত্য বলিয়া জানে তাহা করিবেই—লোকে যে যাই ভাবুক—বলুক, তাহাতে তাহার আসে যায় না।

অদূরে নিতাইকে দেখা গেল, সে গরু চরাইতে বাহির হইয়াছে। তাহার মা অজিতের বাড়ীর বাহিরের কাজ করে, নিতাই পাড়ার গরু চরায়।

দুর্দ্দান্ত গরুগুলিকে লইয়া বালক হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সমস্ত মাথা দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গৌরীর দিকে দৃষ্টি পড়িতে সে দাঁড়াইল, বাম হাতে কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "উঃ, কি দুষ্ট গরু ওই মুখুয্যেদের রাঙি গাইটা দিদিমণি, তিনমাসের মধ্যে ওকে আমি কায়দায় আনতে পারলুম না। এই তো আরও সব গরু রয়েছে, যে দিকে নিয়ে যাই সেই দিকে চলে: আর এই রাঙি

গাইকে যদি বলি পূবে চল—ও চলবে পশ্চিমে; যদি বলি আস্তে হাঁট, ও চলবে দৌড়ে। এ রকম গরু নিয়ে এই দুপুরে রোদে আমার আর কাজ করা পোষাবে না দেখছি।"

গৌরী চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, "গরু পিছু কত করে দেয়?"

নিতাই বলিল, "তা দেয়, চার আনা করে প্রতি গরুর জন্য দেয়।"

গরুগুলার পানে তাকাইয়া গৌরী বলিল, "ইস্, তা হলে তো তোর অনেক টাকা হয় রে। কুড়ি পঁচিশটা গরু—মাসে তা হলে পাঁচ ছয় টাকা জমে। খাওয়া পরা থাকা—এ সব তো অজিত দার কাছেই হয়, তবে অত টাকা করিস কি?"

নিতাই মুখ ভার করিয়া বলিল, "বেশী টাকা কই দিদিমণি—ওই তো কয়টা করে টাকা, সব ডাক্তার বাবুর কাছে দেই, তিনি জমিয়ে রাখেন। ডাক্তারবাবু বলেছেন টাকা জমালে তাঁর বাড়ীর পেছনের বাগানে আমাদের ঘর তুলে দেবেন, সেখানেই আমরা থাকতে পারব।"

গৌরী বিজ্ঞের মত মাথা দুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, সেটা করলে সত্যিই ভালো হয়, এক ঘর গেরস্ত বসতে পারে। তাই করিস নিতাই, যা পাবি অজিতদার কাছেই দিবি, অজিতদা সব ঠিক করে দেবে।

রাঙি গাই ততক্ষণে পথের ধারে একটা বাগানে বেড়া পার হইয়া পড়িয়াছে, নিতাই সেদিকে তাকাইয়া ভারি চঞ্চল হইয়া উঠিল।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "এই মাত্র বাড়ী হতে আসছিস তো, —অজিত দার খাওয়া দাওয়ার কি হল দেখেছিস কিছু ?"

নিতাই বলিল, "ওপাড়ার রাঙা দিদি সকাল বেলাই এসে সব ঠিক করে দিয়েছেন, বাবু শুধু ভাত চড়িয়েছেন আর নামিয়েছেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে, তিনি এখন শুয়েছেন।"

গৌরীর বুকের ওপর হইতে একটা ভারি বোঝা যেন নামিয়া গেল, নিশ্চিন্ত ভাবে সে ফিরিল।

মনের একটা অতি গোপন স্থানে কি একটা ব্যাথা জাগিয়া খচ-খচ করিতেছিল, গৌরী জোর করিয়া সেটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

এতো ভালোই হইয়াছে, তাহাকে যাইতে হইল না, রাঙাদি সব ঠিক করিয়া দিয়াছেন। একে তো এমনিতেই রক্ষা নাই,—লোকে কত না কথাই বলিতেছে, আবার হবিষ্যের যোগাড় করিতে গেলে রক্ষা থাকিবে না।

সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সাত

অজিতের সংসারে এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সংবাদ পাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসিত সপরিবারে কর্ম্মস্থল পাবনা হইতে দেশের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন, ভগিনী কমলাও এই দুঃসংবাদ পাইয়া অবিলম্বে এখানে চলিয়া আসিল, শূন্য বাড়ী আবার পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কমলা বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া—ছোড়দার পানে তাকাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল, লীলা গোপনে চোখ মুছিতে লাগিল, অসিত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন।

অজিত মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখছ বউদি, কি রকম ভূতুড়ে বাড়ী হয়েছে। এই বাড়ী আগেও দেখেছ, এখনও দেখছ,—আমি একা এই শ্মশানে ব্রহ্মদৈত্যের মত বাস করছি।"

লীলা চোখ মুছিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "উপস্থিত শ্মশানই হয়েছে বটে, মানুষ না থাকলে তাই-ই হয়, কিন্তু আবার এই শ্মশানই মানুষ জনে ভরে উঠবে ভাই। ধাক্কাটা প্রথমটায় বড় বেশী রকমই লাগে, দিন যত যায় আবার সবই সয়ে যায়।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বিবর্ণ মুখে অজিত বলিল, "কি রকম, —কি সয়ে যায় বউ দি?"

তাহার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া লীলা চকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইল, বলিল, "না, আমি বলছি কি, শোক এমন জিনিস নয়,—শুধু বাড়ী ঘরই নয়, মানুষকে পর্য্যন্ত একেবারে বদলে দেয়,—তার প্রমাণ স্বয়ং তুমি। তোমায় এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে তোমায় দেখলে আর চেনা যায় না।

কমলার কোলে একটী ছেলে—মাস আট নয় তাহার বয়স হইবে। ছেলেটী হৃষ্টপুষ্ট—বড় সুন্দর। অজিত তাহাকে কমলার কোল হইতে জোর করিয়া টানিয়া লইল; তাহাকে উঁচু করিয়া—লুফিয়া, তাহার মুখে অজস্র চুমা দিয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। কমলা ও লীলা উভয়ে মিলিয়া নিতাইয়ের মায়ের সহায়তায় বাড়ী পরিষ্কার করিতে মন দিল।

বৈঠকখানা তখন পাড়ার লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অসিত পাবনার কৃতবিদ্য উকীল, দেশের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে। লীলা পাবনা জেলার কোন বিখ্যাত ধনী বংশের একমাত্র কন্যা; তাহার পিতা কন্যার সহিত অসিতের বিবাহ দিয়া জামাতাকে একেবারে নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। মা থাকিতেই অসিত দেশে আসা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কদাচিৎ আসিলেও দুই একদিনের বেশী থাকিতে চাহিত না।

অসিত সরকার পক্ষের উকীল ছিলেন—সরকার তাঁহার উপর অত্যন্ত খুসী ছিলেন।

অজিতের জন্যই তিনি দেশে আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। একান্ত জেদি প্রকৃতির লোক ছিল অজিত, যাহা নিষেধ করা যাইত —জিদের বশে সে তাহাই করিয়া বসিত, ভালোমন্দ কিছুমাত্র বিচার সে করিত না।

প্রথম বেলায় অসিত তাহাকে সংযত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বন্ধনের মধ্যে ফেলিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অজিতের জিদের ও খেয়ালের কাছে তাঁহার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল!

রায় বাহাদুর খেতাবধারী দেশের প্রবল প্রতাপশালী জমীদার মহাশয় যখন স্বেচ্ছায় সেই অজিতের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন, তখন অসিত হাত বাড়াইয়া আকাশের চাঁদ পাইয়াছিলেন। জমীদার মহাশয় স্বয়ং এম এল সি, তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করা নেহাৎ মুখের কথা নয়।

জমীদার বিশ্বনাথ রায়ের ইচ্ছা ছিল জামাতাকে তিনি বেশ বড় গোছের একটা কাজ দিবেন, কিন্তু অজিত তাঁহার সকল আশাই ব্যর্থ করিয়া দিল, সে চাকরী লইল না।

লীলা অজিতের বিবাহের সেই প্রথম এখানে আসিয়াছিল। শাশুড়ী সেই প্রথম পুত্র বধূকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কমলা বউ-দিদির পায়ের ধূলা লইয়াছিল।

মাস দুই থাকিয়া লীলা পুনরায় পাবনায় চলিয়া গিয়াছিল। মাস কত পরে শাশুড়ী যখন মারা যান তখন অসিত একাই শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে দেশে আসিয়াছিলেন, লীলা আসে নাই।

মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে আসিয়া অসিত দেখিলেন অজিত বাড়ীতেই আছে ; এখানেই ডিস্পেনসারি খুলিয়াছে, গ্রামে এবং কাছাকাছি আরও কয়েকখানি গ্রামে বেশ নামও করিয়া লইয়াছে।

অসিত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং জানাইলেন—এখানে এই পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকিয়া অজিত জীবনে কোনদিনই উন্নতি করিতে পারিবেন না, বরং সদরে গিয়া বসিলে নাম হইতে পারে।

নাম—

কথাটা শুনিয়া অজিতের হাসি পায়।

মানুষ সব দিয়া চায় নাম কিনিতে। নামের জন্য মানুষ সব কিছু করিতে পারে, বরাবর ইহাই দেখা যায়।

কি হইবে তুচ্ছ নামে ? আসল কাজ ভুলিয়া তুচ্ছ নামের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকা, নামের জন্য কাজ করা—অজিত চায় না। সে চায় সত্যকার কাজ করিতে, নাম কিনিতে নয়।

কিন্তু অসিত তাহা বুঝিবেন না, কেবল অসিত কেন—সংসারের অধিকাংশ লোকই বুঝিবে না। পূর্ব্বাপর যেমন ধারা চলিয়া আসিতেছে, সে ধারার বিপরীত দেখিলেই তাঁহারা শিহরিয়া উঠিবেন।

তথাপি অজিত বলিল, "কেন, এখানেই তো বেশ আছি দাদা, দেশের লোকের কাজ করা—দেশের উপকার করা—"

অসিত রাগ করিয়া বলিলেন, "নিকুচি করেছে দেশের লোকের —দেশের উপকারের। কথায় আছে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। গাঁয়ের লোকেরা বাঁচলো বা মরলো

সে দেখবার দরকার তোমার আমার কি? দেখো—ওরা ঠিক বেঁচে থাকবে তুমি দেখলেও যা হবে না দেখলেও তাই হবে। অনর্থক কেবল পণ্ডশ্রমই করে যাচ্ছো ওদের জন্যে।"

অজিত একটু হাসে, সাক্ষাতে তাহাই মানিয়া লয়। অন্তরে এই সব পরিত্যক্ত হতভাগ্যদের জন্যই ব্যথিত হইয়া উঠে।

সত্যই ইহাদের দেখিতে কেহ নাই। যাহারা ধনশালী তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া সদরে চলিয়া গেছে তাহারা আজ পাশবিক শ্রেণীভুক্ত,—গ্রামের লোক বলিয়া পরিচয় দিতে তাহারা লজ্জা পায়।

অসিত পাবনায় বেশ নাম, করিয়াছেন,—লোকে তাঁহাকে দেশ হিতৈষী, সমাজ হিতৈষী বলিয়া মানে, সহরে থাকিয়া গ্রাম সম্বন্ধে তিনি লম্বা বক্তৃতা দেন, গ্রামবাসীর দুঃখে তাঁহার চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে।

দূরে থাকিতে অসিত সংবাদ পত্রে অজিতের দেশহিতৈষীতার পবিচয় পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিত; সগর্ব্বে লোকের নিকটে পরিচয় দি.. কিন্তু নিকটে আসিয়া তাহার দাদা যে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

আজ অজিত দেখিতে পাইয়াছে মানুষের স্বরূপ, মানুষের ছদ্মবেশ।

অন্তরে অন্তরে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে পড়িয়াছে —বাল্যে কথা মালায় একদিন ছাগচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রের গল্প পড়িয়া ছিল। কিন্তু ছদ্মবেশের আড়ালে এমন ভাবে নিজেকে গোপন

না রাখিয়া—লোকের নিকট হইতে বাহাদুরী না লইয়া স্বরূপ প্রকাশ করাই ভালো—ইহাতে মানুষ মানুষকে চিনিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারে।

অসিত নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলে।

আট

গৌরী কেবল মাত্র উনান ধরাইতেছিল, আজ অনেক বেলা হইয়া গেছে। কাল একাদশী গিয়াছে, আজ সকাল-সকালই রন্ধনাদি সারিয়া লইবার কথা, কিন্তু হইয়া উঠে নাই।

ভোর বেলায় শয্যাত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই কাকা আসিয়াছিলেন—তাঁহার ছোট মেয়েটীর অসুখ, একবার তাহাকে দেখিয়া আসিতে হইবে।

সাত মাসের মেয়েটীর সর্দি জ্বরের কথা গৌরী শুনিয়াছিল, কিন্তু সে একবারও ওপাড়ায় যায় নাই। তাহার আশঙ্কা ছিল অজিতের স্ত্রীর সেবা করা, অজিতের গৃহে রাত্রিতে থাকা লইয়া গ্রামে

যে সব কথা উঠিয়াছে তাহা কাকা-কাকিমারও কর্ণ গোচর হইয়াছে, এবং একবার তাহাকে সম্মুখে পাইলে যে সে সব কথা তুলিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রামগতির মুখে অসুখের কথা শুনিয়া সে তখনই বাহির হইয়াছিল।

খুকির অবস্থা বিশেষ খারাপ নয়, জ্বর ও সর্দ্দি, কিন্তু সেইটুকুর জন্যই তাহার মা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গৌরী খুকিকে কোলে লইয়া, আদর করিয়া হাসাইল—বলিল, "কোন ভয় নেই কাকি মা, তোমার খুকু বেশ আছে। সামান্য সর্দ্দিজ্বর, আজ সকলই সেরে যাবে।"

কাকিমা বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "কি করেই বা যে ভরসা করি বাছা? কচি মেয়ে, এক মিনিটে তার অবস্থা বদলে যায়। এই তো পাশের বাড়ীর ছোট বাচ্ছাটা কাল ধড়ফড়িয়ে মারা যাচ্ছিল আর কি, ভাগ্যে অজিত ডাক্তার এলো, তাইতে এযাত্রাটা বেঁচে গেল। সে তো দিব্যি ছেলেটী ঠাণ্ডা, দিব্যি হাসছিল—খেলা করছিল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অবস্থা একেবারে এত খারাপ হয়ে গেল।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তাই বলছিলুম কি গৌরী, একবার অজিতকে দেখালে ভালো হয় না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে গৌরীর মন তিক্ত হইয়া উঠিল, সে বলিল, "হবে না কেন—ডাক্তার দেখালে ভালো নয় এ কথা কে বলে?"

কাকিমা হঠাৎ তাহার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে

বলিলেন, "তবে মা, আমার একাজটা তোমাকেই করতে হবে, একবার অজিতকে ডেকে এনে খুকুকে দেখানোর ভার তোমার।"

গৌরী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—বলিল, "আমি ডাকলেই অজিতদা আসবে তোমরা ডাকলে আসবে না তা নয়, তবে কাকাকেই পাঠাও না কেন অজিতদাকে ডেকে আনতে? ডাক্তারের ভিজিট দিলেই ডাক্তার আসবে, সে আর আমি কাকা কি?"

কাকিমা করুণ স্বরে বলিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল, অজিত ডাক্তারকেও আবার ভিজিট দিয়ে ডাকাতে হবে—এও আমার কপালে আছে? আমার যদি ভিজিটটাই দেওয়ার ক্ষমতা থাকে মা, তোমায় তাহলে বলবো কেন—?"

ভিজিট দিবার ক্ষমতা নাই—

গৌরীর মুখে এতটুকু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল।

কাকিমা ততক্ষণ আঙুল গণিয়া তাঁহার খরচের তালিকা খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন—"সংসারের বাজে খরচ কি কম? এই ধর মাত্র তো কুড়ি বিঘে ধানের জমি, তার বছরে খাজনা দিতেই কতগুলি করে টাকা যায়। বাগানটায় ফল তো কিছু নেই—বার বার বলছি বিক্রি করে দাও,—বাপ পিতামোর জিনিস বলে তবু যদি তোমার কাকা বিক্রি করেন। সেই বাগানটী দেখা শোনা করতে মাস মাস সাত টাকা করে মালির মাইনে গুণতে হয়। তোমায় বেশী কিছু না দিতে পারলেও মাস মাস পাঁচ টাকা করে

দিতে হয়। তারপর বাড়তি খরচ যে কত তার ঠিক নেই। গাঁয়ে রক্ষেকালী পূজো হবে—দাও চাঁদা, অষ্টম প্রহর হবে—দাও চাঁদা, মঙ্গলচণ্ডী পূজো, বছরে বছরে কালী, সরস্বতী পূজো—বারোয়ারী দুর্গা পূজো,—এ সব কি বড় কম খরচ মা—? কত কষ্টে যে আমি সংসার চালাই, তা তো কাউকে বললে, বুঝবে না। বাইরে থেকে হ্যাংলামি দেখাইনে বলে সবাই মনে করে—এরা বেশ আছে।"

গৌরীর মাসিক পাঁচ টাকাও বাজে খরচের মধ্যে ধরা হইয়াছে। বৎসরের শেষে যখন পাঁচকে বারো দিয়া গুণ করিয়া ষাট বলিয়া ধরা হয়, তখন, এই লোকসানের ব্যথা সামলাইতে কাকা ও কাকিমার বোধ হয় পাঁচ দিন লাগে।

কাকিমা একটু থামিয়া আরও বাজে খরচ মনে করিতেছিলেন, অধৈর্য্য হইয়া গৌরী বলিল, "থাক থাক, বাজে খরচ যে অনেক হয় তা আমি বুঝেছি! মোটকথা এই বল যে আমায় যেমন মাসে পাঁচ টাকা করে সাহায্য করছো, তার বদলে কিছু কাজ করিয়ে নিতে চাও—এই তো—?"

যেন মরমে মরিয়া গিয়া কাকিমা বলিলেন, "ছি ছি, ও কথা তুমি মনেও এনো না গৌরী। তোমারই টাকা তুমি নিচ্ছো, বাপের কাছেও যেমন দাবি করতে, কাকার কাছেও তেমনি দাবি করেছো, জোর করে আদায় করেছো। তাতে আমি এতটুকু দোষ ধরিনে গৌরী,—সত্যি এই পাঁচ টাকা করে পেয়ে তোমার অনেক সাহায্য হয়—তা আমি জানি। টাকা দিচ্ছি বলেই তোমায়

দিয়ে যে কাজ করিয়ে নিতে চাই, অত ছোটলোক তুমি আমাদের ভেবোনা মা। আমি বলছিলুম কি—অজিত ডাক্তারের সঙ্গে তোমার বেশ জানাশোনা আছে,'—

বাধা দিয়া গৌরী তিক্তকণ্ঠে বলিল, "অতএব যেন আমিই গিয়ে ডেকে আনি—কেমন তো?"

কৃতার্থ হইয়া গিয়া কাকিমা বলিলেন, "ঠিক কথা মা, তাতে আর ভিজিটটা লাগবে না। একে ছাপোষা লোক, কোনরকমে না হয় ওষুধ কিনবার টাকা যোগাড় করতে পারব, তাই বলে ডাক্তারের ভিজিট দেওয়ার টাকা যে যোগাড় করতে পারব তা নয়।"

আবার একটা দম লইয়া তিনি বলিলেন "ওষুধ তো ওষুধ, তারও আবার দাম এত যে রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বিকিয়ে যেতে হয়। সেবার সেই বড় খোকার অসুখের সময় ওষুধ এসে-ছিল—তাতেই বুঝেছি—ওষুধের কি দাম। একটু লাল নীল রং মিশিয়ে দেয়, এক এক দাগের দাম চার আনা ছয় আনা। এ ওষুধ কি আমাদের মতন লোকের কিনে খাওয়ান সম্ভব? তাই না আজ কয়দিন বেলের পাতা, শিউলি পাতা এই সব ছেঁচে তার রস খাওয়াচ্ছি।

গৌরী বললে, "তুমি ভুল করেছ কাকিমা, আমি আজ অজিত দাকে ডাকতে গেলেই তিনি যে আসবেন, এ ধারণা করাই তোমার ভুল। অজিতদাকে কোনদিন আমি এ রকম অন্যায় অনুরোধ করিনি, কোনদিন করবও না, কাজেই এ সম্বন্ধে আমায় কোন কথা বলাই মিথ্যে।"

কাকিমা গৌরীর একজেদী স্বভাবের কথা জানিতেন তাই আর বেশী কথা সে সম্বন্ধে বলা উচিত নয় জানিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

করুণ সুরে বলিলেন, "তবে এখন উপায়, মেয়েটা কি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ?"

গৌরী বলিল, "কাকার কোলে দিয়ে অজিতদার ডাক্তারখানায় পাঠাও না কেন। সকাল হতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত অজিতদা ওখানে রোগী দেখেন, ব্যবস্থাপত্র করে দেন। কাকা তো অনায়াসে এ কাজ করে আসতে পারেন।"

ললাটে করাঘাত করিয়া কাকিমা বলিলেন, "পোড়া কপাল, ওই মানুষকে সে কথা কি আর বলতে বাকি রেখেছি ? বলেন— উনি কখনও অজিত ডাক্তারের ডাক্তারখানায় যান নি, আজ কোন মুখে কি বলে সেখানে যাবেন ?"

গৌরীর ইচ্ছা হইল সেও বলে—তাহারই বা এমন কি দায় পড়িয়াছে। সেও তো কখনও অজিতদার ডাক্তারখানায় যায় নাই, আজ পরের জন্য সেই বা কেন যাইবে—?

কিন্তু শিশুর মলিন কচি মুখখানা চোখে পড়িতে সে তাহার বক্তব্য হারাইয়া ফেলিল ; বলিল, "বেশ, কাকা না যেতে পারেন, আমিই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।"

খুকিকে একটা চাদরে ঢাকিয়া লইয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কাল গিয়াছে একাদশী, উপবাসে দেহ আজ বড় দুর্ব্বল মনে হইতেছে। কোথায় সকালে স্নান করিয়া আসিয়া জল খাইয়া রান্না চড়াইবে, না কপালে একি দুর্ভোগ!

পা চলিতে চাহিতেছিল না, তথাপি গৌরী চলিল।

সমাগত রোগী দেখা শেষ করিয়া অজিত বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে মাত্র, এমন সময় গৌরী আসিয়া পড়িল, বুকের উপর ঘুমন্ত একটী শিশু। গৌরী এইটুকু পথ আসিতে রীতিমত হাঁপাইয়া উঠিয়াছে মনে হইতেছে—এই সময় যদি সে জল পায় কলসীর পর কলসী নিঃশেষ করিয়া দিবে।

অজিত তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "একি গৌরী—?"

গৌরী একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল, জিহ্বা দিয়া ওষ্ঠ লেহন করিয়া উত্তর দিল, "কাকার মেয়ে, অসুখ কিনা, দেখাতে এসেছি।"

অজিত গৌরীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিল, "বুঝেছি, কিন্তু একে তাঁরই আনা উচিত ছিল।"

গৌরী বলিল, "ছিল—কিন্তু তিনি পারেন নি।"

"পারেন নি কিন্তু পারাই উচিত ছিল—"

অজিত শিশুটীকে পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল, "কা[illegible] একাদশী গেছে না গৌরী—আজ দ্বাদশীর দিন তোমার স্নান করা, জল খাওয়া হয়েছে কি?"

গৌরী চঞ্চল হইয়া উঠিল—

বলিল, "সে হবে এখন অজিত দা, ফিরে গিয়েই স্নান করব, জল খাব। এরকম মাঝে মাঝে হয়—এতে আমাদের এমন কিছু কষ্ট হয় না। বিধবার আবার সুখ অসুখ—সুবিধে অসুবিধে—"

অজিত আর কোন কথা না বলিয়া শিশুটীকে পরীক্ষা করিয়া প্রেস্কৃপশন লিখিয়া গৌরীর হাতে দিল, বলিল—"এমন বিশেষ কিছু হয়নি, সামান্য সর্দ্দিজ্বর, ওষুধ না দিলেও বিশেষ ক্ষতি হতো না। তবে তোমাদের মনে বিশ্বাস হবে না, তাই ওষুধটা লিখে দিলুম, নিয়ম মত তিন বার খেতে দিয়ো—।"

দেয়ালের ঘড়িটার পানে তাকাইয়া অজিত ত্রস্তভাবে বলিল, "বেলা অনেক হয়ে উঠলো গৌরী, বাড়ী যাও। আমাকেও এখনি বার হতে হবে,—যেতে হবে রাজীবপুরে অনেকখানি পথ—

গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল, শিশুটীকে আবার বুকে তুলিয়া লইয়া সে অগ্রসর হইল। পথের মধ্যেই শিশুটী জাগিয়া তারস্বরে চীৎকার সুরু করিয়া দিল।

কাকিমা প্রতীক্ষ্যমানা অবস্থায় প্রায় পথের উপরই দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার কোলে শিশুকে দিয়া গৌরী ডাক্তারের কথা শুনাইয়া প্রেস্কৃপশন দিল।

কাকিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ওষুধটা একেবারে আনলেই হতো, আবার কাকে যে পাই—"

গৌরী এবার সত্যই রাগ করিয়া উত্তর দিল, "কাকাকে পাঠাও

নচেৎ তোমাকেই যেতে হয় কাকিমা। কাল একাদশী গেছে, আজ আর কিছু করা আমার সাধ্যাতীত, যা করেছি এই যথেষ্ট হয়েছে।"

সে ফিরিয়া আসিল।

স্নানান্তে একটা বাতাসা খুঁজিয়া পাইয়া সেইটী খাইয়া সে একেবারে এক নিঃশ্বাসে দুই ঘটি জল খাইয়া ফেলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, "আঃ"—

সুস্থ হইয়া উনান ধরাইতে বসিল।

বার বার শপথ করিল আর নয়, আর কাকার বাড়ীর দিকে যাইবে না। সেই কাকিমা—যিনি তাহাকে বাড়ী হইতে প্রায় তাড়াইয়া দিয়াছেন, আজ তিনিই আবার এত আদর করিয়া ডাকিলেন কেন, তাহা আগে বুঝা তাহার উচিত ছিল। এবার হইতে আর নয়, গৌরী সতর্ক হইয়াছে।

নয়

দিন কয়েক মাত্র থাকিয়া কমলা আবার শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। যাইবার সময় অজিতের হাতখানা ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "লক্ষ্মী ছোড়দা, ঘরটাকে শূন্য রেখো না; পিতৃপুরুষের ভিটেয় আসবার পথটা রেখে দিয়ো, আবার যেন আসতে পারি।"

তাহার উদ্দেশ্য অজিত বুঝিয়াছিল, একটু হাসিয়া বলিল, "পিতৃপুরুষের দরজা চিরদিনই খোলা থাকবে কমলা, আমি যতক্ষণ ভিটেয় আছি ততক্ষণ কিছু ভাবতে হবে না। তবে একটা অসুবিধে, আগে যেমন তৈরী ভাত পেতিস, এখন আর তা পাবি নে, নিজে তৈরী করে নিতে হবে। এইটুকু অসুবিধা ভোগ করতে যদি রাজি থাকিস তবে আসিস।"

কমলাও তাহার কথা বুঝিল; আর একটী মাত্র কথা না বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে বিদায় লইল।

অসীতেরও যাইবার সময় হইয়া আসিল।

সেদিন লীলা অজিতকে আহার করিতে দিয়া বলিল, "আমার একটা কথা আছে ঠাকুরপো,—আশা করছি আমার সে কথা রাখবে।"

অজিত বলিল, "কাথাটা না শুনে রাথার শপথ তো করতে পারিনে বউদি, আগে শুনি কথাটা কি ?"

বউদিও যে কমলার ধারায় চলিয়াছেন সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না।

লীলা বলিল, "তোমার বিয়ে করতে হবে।"

অজিত মুখ তুলিল, বলিল, "এখনও তো বেশী দিন হয় নি বউদি স্বলতা গেছে। অন্ততঃ পক্ষে বছর খানেক যেতে দাও, তার কথাটা একটু পুরানো হোক্—এত শিগ্‌গীরই আবার বিয়ে করলে লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে ?"

লীলা বলিল, "মুখ দেখানোটা কিছু অসম্ভব নয়। এতো তবু কয়েকমাস হয়ে গেছে, অনেক লোককে দেখেছি তার দুইটি মাস যেতে না যেতে আবার বিয়ে করেছে।"

অজিত বলিল, "হতে পারে কিন্তু তারা করেছে বলেই যে আমাকেও করতে হবে তার কোন কথা নেই বউদি।"

লীলা তাহার কথা মানিয়া লইল, বলিল, "সেটা ঠিক, তবে কথা হচ্ছে কি পাত্রী হাতে আছে—এর পরে হয়তো অন্য পাত্র পেলে তার বিয়ে হয়ে যেতে পারে।"

সকৌতুকে অজিত বলিল, "বাঃ, তবে তো সবই ঠিক করে ফেলেছ বউদি, পাত্রী নিশ্চয়ই খুব ভালো।"

উৎসাহিত হইয়া লীলা বলিল, "ভয় নেই, মন্দ মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব না। পাত্রীকে তুমিও অনেকবার দেখেছো—

আমার পিসিমার মেয়ে বিভা। দেখতে খুব ভালো আর মেয়েও আই-এ পড়ছে।"

অজিত একটু হাসিয়া বলিল, "ওইখানেই যে ভুল করলে বউদি, কলেজে পড়া মেয়ে এসে গরীবের এই কুঁড়ে ঘরে সিংহাসন পাতবে কোথায়, আমিই বা তাকে বরণ করে আনব কি করে?"

লীলা রাগ করিল, বলিল, "তাকে বিয়ে করে কি এখানে আনবে নাকি? আমাদের ওখানে তুমি যাবে, ওখানেই ডাক্তারী করবে, বিভা ওখানেই থাকবে। তোমার দাদা সে সব ঠিক করে ফেলেছেন এখন কেবল তোমার সম্মতির অপেক্ষা।

অজিত বলিল, "তাই বল, বিয়ে করে আমায় পাবনাবাসী হতে হবে। কথাটা নেহাৎ মন্দ নয় বউদি কারণ তোমার পিসিমা বিশেষ অর্থশালিনী আর বিভা তার একমাত্র মেয়ে, কাজেই ওসব দিকে আমার লাভ পুরো ষোলআনা।"

লীলা বিজ্ঞের মত বলিল, "সে কথা সত্যি, পিসিমা তাঁর যা কিছু আছে সবই মেয়ে জামাইকে দেবেন। তাহলে তো আমার পক্ষে খুবই ভালো হয়। আমরা দু বোন একটা জায়গাতেই থাকব তোমরা দু ভাই কাজ কর্ম্ম করবে কি বল?"

অজিতের আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল, সে উঠিবার উপক্রম করিল, বলিল, "কিন্তু বউদি, বছর খানেক অপেক্ষা করতে বলো, এখনই বিয়েটা করতে আমার মন রাজি হয় না। তাঁরা যখন সুপাত্র হিসেবে আমাকেই নির্ব্বাচন করেছেন, তখন বছর খানেক যে অপেক্ষা করবেনই সে জানা কথা।"

লীলা দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা, তাই কি হতে পারে ঠাকুরপো? মেয়ে বড় হয়ে গেছে, আঠারো উনিশ বছর বয়েস হল, আরো একবছর রাখা যায় কি?"

অজিত বলিল, "না রাখা যায়, অগত্যা এই সুপাত্রটীর আশা ছেড়ে দিতে হবে বউদি, অশৌচ শুনেছি একবছর থাকে, এ এক-বছরের মধ্যে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।"

নিজের ঘরে গিয়ে অজিত চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

দেয়ালে স্বলতার একখানা ফটো ছিল -সেইখানার দিকে সে চাহিল।

দুনিয়ার মানুষ—সকলেই ভাবে একধারায় চলিবে। বস্ত্র খণ্ড মানুষ যেমন হেলায় ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি-ভাবে প্রেমের পাত্র পাত্রীও গ্রহণ করে—ত্যাগ করে।

স্বলতা,—তোমার কথা ইহারা ভাবিতে দিতেও চায় না, তোমার স্মৃতি বিস্মৃতির অতলতলে ডুবাইয়া দিতে ইহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু না, অজিতের লক্ষ্য অচল হোক, দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হোক তাহার প্রতিজ্ঞা, যত বড় প্রলোভনই আসুক, সে যেন সবই হেলায় জয় করিতে পারে।

অসীত পাবনায় ফিরিবার আয়োজন করিয়া লইলেন।

অজিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার বউদির কথা তো শুনেছো অজিত, আশা করছি সে প্রস্তাবে তোমার কোনও অমত হবে না। শুনলুম তুমি একবছর সময় চেয়েছো, বেশ;—একবছর আমার পিসশাশুড়ী অপেক্ষা করবেন, ততদিনে বিভা না হয়

আই-এ টা পাশ করে ফেলবে। তোমার কথার খেলাপ যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখো।"

অজিত মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি তোমায় সত্যি কথা বলছি দাদা, আমি আর বিয়ে করব না।"

অসীত যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "বিয়ে করবে না—মানে?"

অজিত চুপ করিয়া রহিল।

অসীত বলিলেন, "তোমার একারই স্ত্রী বিয়োগ হয় নি অজিত, জগতে কত লোকের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে—হচ্ছে, তাঁরা কি আবার বিয়ে করেন নি বা করেন না? কয়জন লোক স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে তোমার মত লক্ষ্মীছাড়ার জীবন যাপন করতে চায় বল দেখি?

অজিত শান্ত কণ্ঠে বলিল, "হয় তো নেই, কিন্তু আমি পারব না দাদা। বিয়ে মানুষের একবারই হয়ে থাকে, দুবার হতে পারে না বলে আমার ধারণা। প্রত্যেকেরই মনের গতি এক সমান নয়। আমি ব্রত নিয়েছি, আশীর্ব্বাদ কোর, আমার সে ব্রত আমি যেন একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যেতে পারি।"

"ব্রত?"

অসীত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, বলিলেন "ব্রত আবার কিসের? চিরকাল শুনে আসছি মেয়েরাই ব্রত নেয়, পুরুষের কেউ যে ব্রত নেয়, ব্রত পালন করতে চায় তাতো জানতুম না। কি ব্রত তোমার—সাবিত্রী ব্রত?"

তাঁহার পরিহাসে অজিত একটু হাসিল মাত্র, বলিল, "না,

সাবিত্রী ব্রত নয়, জনসেবা ব্রত। মানুষের উপকার যেন করতে পারি,—প্রত্যেকে যেন আমায় তাদের কাজে পায়, এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা।"

অসীত হাসিলেন, সে হাসি ঘোর অবজ্ঞাপূর্ণ। বলিলেন, "হাসালে অজিত, লোকের সেবা—জনহিতকর কাজ। আরে, এ কাজ কি তুমি বিয়ে করে পাবনায় বসেই করতে পারো না? ডাক্তারের কাজই তো হচ্ছে জনসেবা, কে কোথায় ব্যারামে ভুগে মরছে তাকে বাঁচানো, এতো তুমি যেখানে খুসি থেকে করতে পারো, এখানে থেকেই যে করতে হবে তার কি মানে আছে? আমি পাবনায় থেকে কাজ করছি নে? প্রতিদিন কোর্টের কাজ সেরে বাড়ী আসতে পাই নে, আজ এখানে মিটিং, কাল ওখানে মিটিং, এতো লেগে আছেই বাপু।"

শান্ত কণ্ঠে অজিত বলিল, "মিটিং করে জনসেবার কাজ হয় না বড়দা—কেবল নাম করা যায়, দেশ বিদেশের লোক কর্ম্মী বলে জানতে পারে মাত্র। আমি ওরকম ফাঁকা নাম ঢাক পিটিয়ে করার পক্ষপাতি নই। দেশের কাজ, দশের কাজ করতে গেলে চাই নীরব সেবা, আত্মোৎসর্গ; আত্ম রেখে এ ধর্ম্ম নয়, আত্ম বিসর্জ্জন দেওয়া। আমি চাই সবটুকু বিলিয়ে দিতে, নিজের জন্যে এতটুকু রাখতে নয়, তাই আবার নতুন করে সংসার পাততে পারব না। যাকে গ্রহণ করেছিলুম, তাকে সুখ শান্তি দিতে পারিনি, আবার যাকে গ্রহণ করব, তাকেও দিতে পারব না—কাজেই আর বিয়ে না করাই ভালো।"

অসীত আঘাত পাইয়াছিলেন তাই তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিবর্ণ মুখেই তিনি বলিলেন, "নীরব সেবা অনেক সময় কার্য্যকরী হয় না সে জন্যে চাই ঢাক পিটানোর ব্যবস্থা—মানুষের মনে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলা। প্রতিমা পূজোর সময় গোলমাল না করলেও চলতো, কিন্তু ঢাক না পিটালে পাড়ার লোক পথের লোক জানতে পারে না, বুভুক্ষিতেরাও অজ্ঞ থেকে যায়,—কোথায় প্রসাদবিতরণের আয়োজন হয়েছে তা তারা জানতে পারে না। কিন্তু থাক এ সব কথা—আসল কথা তুমি বিয়ে করবে না— হয়তো কোন দিন তোমার মত পরিবর্ত্তন হবে, হয়তো তুমি বিয়েও করবে, কিন্তু আজ যে সুযোগ তুমি হারালে, সে সুযোগ তুমি আর পাবে না এ জানা কথা। তবে তাই, আমি. সবাইকেই জানিয়ে দেব তুমি বিয়ে করবে না তুমি কোথাও যাবে না, এখানে এই গ্রামেই থাকবে।" তিনি যে রাগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল।

সেই দিনই সপরিবারে তিনি পাবনা যাত্রা করিলেন।

দশ

গৌরী বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, পথে দেখা হইল অজিতের সঙ্গে—

অনেকদিন দেখা হয় নাই, অসীত চলিয়া গিয়াছেন খবর সে পাইয়াছে। লীলা ও কমলা থাকিতে একদিন গৌরীর সহিত তাহাদের দেখা হইয়াছিল মাত্র, কমলা তাহাকে নিজেদের বাড়ী আসিবার জন্য বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও গৌরী নানা কাজের মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারে নাই।

অজিতের দক্ষিণ হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। প্রথমেই গৌরীর দৃষ্টি সেই বাঁধা হাতের উপর পড়িল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ অজিত দা, হাতে কি হয়েছে?"

ক্লান্ত হাসি হাসিয়া অজিত বলিল, "আর বল কেন,—অকর্ম্মার ঢেঁকি কিনা, হাতে তারই ফল ফলেছে।"

ব্যগ্র হইয়া গৌরী বলিল, "কিসের ফল?"

অজিত বলিল, "বিশেষ কিছু নয়, একটু পুড়ে গেছে কিনা—"

সে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল—"অনেক বেলা হয়ে গেছে,

দুটো বেজে গেছে, সর দেখি—বাড়ী যাওয়া যাক—আবার খাওয়া দাওয়া আছে তো।"

"এখনও খাওয়া হয় নি—স্নানও হয়নি—?"

গৌরীর অন্তর অকস্মাৎ করুণায় ভরিয়া উঠিল।

অজিত হাসিয়া বলিল, "পাগল, রোজই তো এমনি হয়। কোনদিন দুটো কোনদিন তিনটে, কোনদিন পাঁচটাতেও ফিরে আসি। বার হতে হয় সেই নয়টার সময়, সব রোগী দেখে—ব্যবস্থা করে।"

গৌরী বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়?"

অজিত বলিল, "কি আবার হবে। নিতাই সব ঠিক করে দিচ্ছে, যা হয় করে দুটো ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খাই। অবিশ্যি কাল হাতে হাঁড়ি পড়েছে, পরশুও তো বউদি করে দিয়েছে।"

গৌরী বলিল, "হাত বোধ হয় কালই পুড়েছে।"

অজিত উচ্চ হাসিল—"ঠিক ধরেছ, কালই পুড়েছে। একেবারে অকর্ম্মা কিনা, যেমন ভাতের হাঁড়িটাকে কাত করেছি অমনি খানিকটা ফুটন্ত ফেন পড়বি তো পড়—একেবারে হাতের ওপরই এসে পড়লো। আর বল কেন—ভাত রান্নাটা আগে স্নলতা থাকতে দু একদিন যদি দেখে নিতুম তা হলে জানা থাকতো। কি করবো বল, জানিনে তো—স্নলতা তাড়াতাড়ি চলে যাবে, আমাকেই আবার ভাত রেঁধে খেতে হবে।"

বেচারা—

গৌরীর মুখখানা মলিন হইয়া গেল, আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আর কেউ কি নেই—যাকে কিছু করে দিলে সে রেঁধে দিয়ে যাবে? তুমি এ রকম করে কতদিন চালাতে পারবে অজিতদা? এই দুটো তিনটের সময় বাড়ী গিয়ে স্নান করে রান্না করাও তো ঝকমারী।"

অন্যমনস্কভাবে অজিত বলিল, "ঝকমারী বলে ঝকমারী—প্রাণান্ত। কাল হাতটা পুড়ে গেলে যত রাগ পড়েছিল সুলতার পরে—জানো গৌরী? মনে হল—সে কেন মরল? মরবে এ কথাটা জেনে আগে আমায় কেন কর্ম্মঠ করে গেল না, কেন এ সব আমায় শিখিয়ে গেল না?"

বলিতে বলিতে আবার সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—

"দেখেছো, মরা মানুষের পরও রাগ করতে পারি। কিন্তু সে কথা যাক—এখানে কাকেই বা বলব রাঁধতে? বুড়ি রাঙ্গাদি কিছু দিন রেঁধে দিয়েছিলেন, বউদিরা আসতে তিনি সরে দাঁড়ালেন। এখন আবার তাঁকে বলিই বা কি করে—ওগো, তুমি এসো, আমায় দুটো ভাত রেঁধে দাও।"

গৌরী বলিল, "রমার দিদিকে বললে—"

বাধা দিয়া অজিত বলিল, "তুমিই রেঁধে দাও না গৌরী—আবার কাকে বলতে যাব—কে আসবে—বা আসবে না তাই বা কে জানে? দেখ, তুমি না হয় মাসে কিছু করে নাও—আমায় শুধু দুপুর বেলা দুটো রেঁধে দাও। রাত্রে খাওয়ার বালাই নেই, একবেলা খেতে পেলেই ঢের মনে করব।"

কথাটা সে পরিহাসের সঙ্গেই বলিল, কারণ এ জানা কথা—গৌরী যাইবে না।

কিন্তু গৌরী রাজি হইয়া গেল—বলিল, "আমি তা পারি, তোমায় সে জন্যে আমায় কিছু দিতে হবে না অজিত দা।"

বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল, মনে হইল গ্রামের কথা, একদিন ঘাটে দাক্ষায়ণীর কথা—কাকিমার সহজ উক্তি গুলা।

আজ অজিতের বাড়ী রাঁধিতে গেলে কাল সারা গ্রামে যে আন্দোলন উঠিবে—তাহা তাহার অজ্ঞাত নয়। হয় তো কাল সে পথে বাহির হইতে পারিবে না,—যাহার সহিত দেখা হইবে সেই তীব্র বিদ্রূপ করিবে।

কিন্তু করুক বিদ্রূপ, করুক উপহাস—গৌরী দৃঢ়চিত্তে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে।

গৌরী বলিল, তুমি যাও অজিত দা, আমি বাসনগুলো তুলে রেখে এখনি আসছি।"

অজিত ভাবিয়াছিল—গৌরী আসিবে না—তাহাকে মিথ্যা সান্ত্বনাই দিয়াছে মাত্র।

বাড়ী ফিরিয়া নিতাইকে উনানে আগুন দিতে বলিয়া অজিত একটু বিশ্রাম করিয়া লইল। নিতাইয়ের মা উপস্থিত তীর্থভ্রমণে গিয়াছে, নিতাই মাস খানেকের মত গরু চরানো কাজের ছুটি লইয়া অজিতের গৃহকর্ম্ম করিয়া যায়।

অজিত স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল গৌরী আসিয়াছে; রান্না-

ঘরে উনানে ভাত বসিয়াছে এবং গৌরী তরকারী কুটিতে বসিয়াছে।

অজিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অবশেষে সত্যিই এলে গৌরী ?"

গৌরী তরকারী কুটিতে কুটিতে বলিল, "না এসে আর উপায়ই বা কি, অজিত দা, তোমার হাতের অবস্থা তো ওই, রাঁধবেই বা কি আর খাবেই বা কি করে ? বেলা তিনটে বাজে, এখন স্নান করে এসে রান্না করার ধৈর্য্য মেয়েদের থাকতে পারে, পুরুষ মানুষের থাকতে পারে না। তুমি একটু বসো গিয়ে ঘরে, আমার ভাত প্রায় হয়ে এলো, এই তরকারীটা করেই ভাত দেব।"

অজিত বারাণ্ডাতেই বসিয়া পড়িল, বলিল "তা হলে সত্যিই চাকরী নিলে গৌরী ; কিন্তু লোকে যা না তাই কথা বলবে।"

গৌরী তরকারী কোটা ছাড়িয়া ভাত দেখার দিকে মন দিয়াছিল, বলিল, "লোকে অনেক কিছুই বলেছে অজিত দা, আর একবারও না হয় বলবে।"

অজিত চুপ করিয়া রহিল—।

তাড়াতাড়ি তরকারীটা করিয়া লইয়া গৌরী অজিতকে ভাত বাড়িয়া দিল। অজিতের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া গেল তখন রাঙাদিদিকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল—।

উঠান হইতে তিনি বলিতেছিলেন, "কাল নাকি ফ্যান পড়ে তোর হাতখানা পুড়ে গেছে অজিত! পোড়াকপাল আমার,

এ কথাটা সকালে একবারটি যদি জানাতিস, আমি নিজের কাজ ফেলেও আসতুম। পোড়ারমুখো নিতাই যখন আমায় বললে—"

বলিতে বলিতে রন্ধনগৃহের দরজায় আসিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

বিশ্বাস হয় না—গৌরী আসিয়া রন্ধন করিয়াছে, অজিতকে খাইতে দিয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকে, গৌরী না?"

অসঙ্কোচেই গৌরী উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমিই রাঙাদি। অজিতদার হাত পুড়ে গেছে শুনে রাঁধতে এসেছি। মানুষটা না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে গাঁয়ে এত লোক থাকতে—এও কখনও হতে পারে তুমিই বল।"

রাঙাদিদি বলিলেন, "এসেছিস বেশ করেছিস, নইলে বাছা অজিতের আজ খাওয়াটাও হতো না। আজকের দিনটা তো কোন রকমে পার হল, আবার কালকের ভাবনা আছে তো, আমি তাই ভাবছি কাল কি হবে।"

গৌরী বলিল, "কালকের জন্যেও কোন ভাবনার দরকার হবে না। আমি যে অজিতদার রাঁধুনির কাজ নিলুম রাঙাদি, দুবেলা এসে রেঁধে খাইয়ে যাব, দশ টাকা করে নেব।"

"দশ টাকা মাইনে—?"

গৌরী বলিল, "মন্দটা কি। দুবেলা দুটো রেঁধে দিয়ে যাওয়া বই তো নয়—ও আমি খুব পারব যদি মাসে দশটা করে টাকা পাই। অভাব বড় বেড়ে উঠেছে রাঙাদি, কাকা পাঁচ টাকা

ঘরে উনানে ভাত বসিয়াছে এবং গৌরী তরকারী কুটিতে বসিয়াছে।

অজিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অবশেষে সত্যিই এলে গৌরী?"

গৌরী তরকারী কুটিতে কুটিতে বলিল, "না এসে আর উপায়ই বা কি, অজিত দা, তোমার হাতের অবস্থা তো ওই, রাঁধবেই বা কি আর খাবেই বা কি করে? বেলা তিনটে বাজে, এখন স্নান করে এসে রান্না করার ধৈর্য্য মেয়েদের থাকতে পারে, পুরুষ মানুষের থাকতে পারে না। তুমি একটু বসো গিয়ে ঘরে, আমার ভাত প্রায় হয়ে এলো, এই তরকারীটা করেই ভাত দেব।"

অজিত বারাণ্ডাতেই বসিয়া পড়িল, বলিল "তা হলে সত্যিই চাকরী নিলে গৌরী; কিন্তু লোকে যা না তাই কথা বলবে।"

গৌরী তরকারী কোটা ছাড়িয়া ভাত দেখার দিকে মন দিয়াছিল, বলিল, "লোকে অনেক কিছুই বলেছে অজিত দা, আর একবারও না হয় বলবে।"

অজিত চুপ করিয়া রহিল—।

তাড়াতাড়ি তরকারীটা করিয়া লইয়া গৌরী অজিতকে ভাত বাড়িয়া দিল। অজিতের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া গেছে তখন রাঙাদিদিকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল—।

উঠান হইতে তিনি বলিতেছিলেন, "কাল নাকি ফ্যান পড়ে তোর হাতখানা পুড়ে গেছে অজিত। পোড়াকপাল আমার,

এ কথাটা সকালে একবারটি যদি জানাতিস, আমি নিজের কাজ ফেলেও আসতুম। পোড়ারমুখো নিতাই যখন আমায় বললে—"

বলিতে বলিতে রন্ধনগৃহের দরজায় আসিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

বিশ্বাস হয় না—গৌরী আসিয়া রন্ধন করিয়াছে, অজিতকে খাইতে দিয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকে, গৌরী না?"

অসঙ্কোচেই গৌরী উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমিই রাঙাদি। অজিতদার হাত পুড়ে গেছে শুনে রাঁধতে এসেছি। মানুষটা না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে গাঁয়ে এত লোক থাকতে—এও কখনও হতে পারে তুমিই বল।"

রাঙাদিদি বলিলেন, "এসেছিস বেশ করেছিস, নইলে বাছা অজিতের আজ খাওয়াটাও হতো না। আজকের দিনটা তো কোন রকমে পার হল, আবার কালকের ভাবনা আছে তো, আমি তাই ভাবছি কাল কি হবে।"

গৌরী বলিল, "কালকের জন্যেও কোন ভাবনার দরকার হবে না। আমি যে অজিতদার রাঁধুনির কাজ নিলুম রাঙাদি, দুবেলা এসে রেঁধে খাইয়ে যাব, দশ টাকা করে নেব।"

"দশ টাকা মাইনে—?"

গৌরী বলিল, "মন্দটা কি। দুবেলা দুটো রেঁধে দিয়ে যাওয়া বই তো নয়—ও আমি খুব পারব যদি মাসে দশটা করে টাকা পাই। অভাব বড় বেড়ে উঠেছে রাঙাদি, কাকা পাঁচ টাকা

করে দেন, তাতে মোটে দিন চলে না। অজিত দা দিতে চান মাত্র আট টাকা, কিন্তু আট টাকায় আমার চলবে কি করে? অজিতদাকেও বাধ্য হয়ে দশ টাকায় রাজি হতে হল, কি বল অজিতদা?"

অজিত বিস্মিত নেত্রে গৌরীর পানে তাকাইয়া রহিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রাঙাদিদি বলিলেন, "তাই তি, দশটাকা কি বড় কম? তা আমিও তো করতে রাজি ছিলুম, কত দিন দিয়েওছি রেঁধে, আমাকে বললেই কি আমি পারতুম না?"

গৌরী উৎসুক হইয়া বলিল, "তবে তুমিই কর না কেন রাঙাদি?"

রাঙাদিদি বলিলেন, "না ভাই, কারও মুখের গ্রাস নিয়ে আমি পেট ভরাতে চাই নে,—আমি যেমন আছি এই আমার ভালো।"

অজিত বলিল, "কিন্তু রাঙাদি যদি ইচ্ছে করো—"

রাঙাদিদি বলিলেন, "রক্ষে কর দাদা, আর ও সবে দরকার নেই। যাক, খাওয়া কি হল দেখতে এসেছিলুম, এবার আমি যাই, সংসারের কাজ কর্ম্ম আছে তো।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

অজিত একটু হাসিয়া বলিল, "ঠিক জায়গায় আগুন ধরিয়েছ গৌরী, আধ ঘণ্টার মধ্যে সারা গাঁয়ে একথা রাষ্ট্র হয়ে যাবে, তখন বিপদ হবে তোমার।"

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে গৌরী বলিল, "আমার আবার কি বিপদ হবে—দেখো তুমি—কেউ কিছুই করতে পারবে না। এক ঘরে

করবে, তা করুক। বিধবার আবার এক-ঘরেই বা কি, দশ ঘরেই বা কি, বিধবা তো লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাবে না। একটা ছেলে কি মেয়ে নেই, যার বিয়ে পৈতের জন্যে ওদের কথা অন্যায় জেনেও মেনে নেব।"

বলিতে বলিতে সে হাসিয়া উঠিল।

একটু পরে হাসি থামাইয়া বলিল, "একটা শাসনের পথ আছে—আমি মরলে কেউ আমার সংকার করবে না। নাইবা করলো—তাতেই বা ক্ষতি কি? মরে যখন ঘরে পড়ে থাকবো—তখন গন্ধের ভয়ে বাধ্য হয়ে ওদেরই ফেলতে হবে। আর ফেললো না ফেললো তাতে আমারই বা কি,—আমি তো আর দেখতে আসব না।"

অজিত অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "হ্যাঁ, এ একটা বেপরোয়া উপায় আছে বটে। যাই হোক, সে তো মরার পরের কথা এখন বেঁচে থেকে ঠেলাটা সামলাও তো আগে।"

গৌরী কেবল ঠোঁট উল্টাইল।

এগার

পাবনা হইতে অসিতের দীর্ঘপত্র আসিয়া পৌঁছিল।

অসিত নানা কথার পর লিখিয়াছেন—"এ সব কি শুনিতে পাইতেছি অজিত; আমি এ সব কথা আজও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার বউদি বিশ্বাস করিয়াছে। তুমি কি সত্যই অধঃপাতে গিয়াছ—সত্যই কি সেই জন্য বিবাহ করিলে না? ছি ছি, আমি রামহরি দত্তের পত্রে তোমার সম্বন্ধে এ সব কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত শান্তি পাইতেছি না। আমাকে সমস্ত কথা লিখিয়ো। শুনিলাম গৌরী নাকি মাসিক দশ টাকা বেতনে তোমার ওখানে কাজ করিতেছে—এ কথা কি সত্য? অত বড় গ্রামটায় দুইটা ভাত রাঁধিয়া দিবার লোক কি তুমি পাইলে না?

আমার কথা রাখিবে—গৌরীকে অবিলম্বে পত্র পাঠ মাত্র বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিবে তাহাকে আর বাড়ী রাখিবে না। যদি আমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাও, এ কাজ পত্র পাঠ করি‍, নচেৎ তোমার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক রহিবে না।"

পত্রখানা পড়িয়া অজিত খানিকক্ষণ গুম হইয়া রহিল, তাহার পর সেখানা পকেটে রাখিয়া নিত্যকার কার্য্যে বাহির হইল।

রোগী দেখিবার ফাঁকে ফাঁকে তাহার মনে হইতেছিল—একি দুরপনেয় কলঙ্ক তাহার মাথায় চাপিল? গৌরীকে সে তো কোন দিন খারাপ দৃষ্টিতে দেখে নাই, গৌরীও তাহাকে নিজের ভাইয়ের মত ভাবে, লোকে তাহা বুঝিল না কেন? মানুষের একি জঘন্য প্রকৃতি, কেন তাহারা ভালো ছাড়িয়া মন্দ ধরিয়া বসে?

অনেক বেলায় যখন সে বাড়ী ফিরিল গৌরী তখন ভাত চড়াইয়া দিয়াছে, তরকারী হইয়া গেছে। নিতাইয়ের মা নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়াছে, নিতাই সাংসারিক কাজে ছুটী পাইয়া আবার গরু চরানো কাজে লাগিয়াছে।

গৌরী রান্না ঘরের ভিতরে একখানা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে, নিতাইয়ের মা বারাণ্ডায় বসিয়া গল্প করিতেছে। নূতন সে নবদ্বীপ দেখিয়া আসিয়াছে, নবদ্বীপের প্রশংসায় সে মুখর।

সংসার নাকি আর তাহার ভালো লাগিতেছে না। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়া তবে দুইটা পেটের ভাতের যোগাড় করিতে হয়, আর নবদ্বীপ—সোনার নবদ্বীপে সকালে সন্ধ্যায় দুবার নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলেই সিধা মিলে। দিন যেমন তেমন করিয়া কাটাইয়া সকাল সন্ধ্যায় নাম কীর্ত্তন করিলেই হইল।

গৌরী বলিতেছিল, "নিতাইকেও নিয়ে যাবি নাকি নিতায়ের মা—?

নিতাইয়ের মা বলিল, "ও এখন দিব্যি বড় হয়ে গেছে; আর আমার সঙ্গে গেলে তো ওর চলবে না—ওর আহার নষ্ট করব না।

আমার আর কি মা, তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে—আমার দিন যেমন করেই হোক জুটে যাবে। ও আমার কাজ কর্ম্ম করুক, —তোমাদের কাজে যেতে ওর একটা হিল্লে হোক।"

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "নিতাইকে ফেলে যেতে পারবি নিতাইয়ের মা—"

নিতাইয়ের মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ফেলে যাওয়া কি মুখের কথা মা, তবু ফেলে যেতে চাচ্ছি—পোড়া পেটের জ্বালায় আর সহ্যি হচ্ছে না, তাই। এখানে থেকে লাঞ্ছনার তো শেষ নাই, অন্ত্যজাত বলে হাতের জল নেওয়া তো দূরের কথা—ছায়াটা কেউ মাড়াতে চায় না। মানুষ হয়ে মানুষকে এত ঘেন্না কখনো করতে আছে? পোড়া লোকে কি ভাবে—তারাও যাবে যেখানে আমিও যাব সেখানে, শাস্তি সমানই ভোগ করতে হবে। অনেক দুঃখেই এদেশ ছাড়তে চাচ্ছি মা,—মানুষের ওপর মানুষের অবহেলা আর সহ্যি হয় না। তবু যা হোক সেখানে দুটো খেতে পাব তো? আর ডাক্তার বাবু যতক্ষণ থাকবেন আমার নিতাই, খেতে পাবে।"

তাহার দুই চোখ জল জল করিতেছিল।

মানুষের উপর মানুষের অবহেলা—কথাটা পরম সত্য। নিতাইয়ের মা অন্ত্যজ বলিয়া তাহার কোথাও স্থান নাই—ক' মনের দুঃখেই সে এ দেশ ছাড়িতে চায়।

গৌরী কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল—অজিত ফিরিয়াছে। কিন্তু তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

সে গৌরীকে ডাকিয়া অন্যদিনের মত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, সোজা নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, অজিত স্নান করিতে বাহির হইল না, গৌরীর ভাতও হইয়া গেল।

উৎকণ্ঠিত নিতাইয়ের মা বলিল, "ডাক্তারবাবু খাবেন না?"

গৌরী বলিল, "খাবেন বই কি।"

নিতাইয়ের মা বলিল, "মুখখানা বড় ভার মত দেখছি।"

গৌরী বলিল, "হয় তো কোন রোগী নিয়ে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে—মনটা সে জন্যে ভালো নেই।"

এমনই সময় অজিত বাহির হইল, জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল "এই যে আমি স্নান করতে যাচ্ছি গৌরী। তোমাকে আজ বড় দেরী করিয়ে দিলুম—"

গৌরী বলিল, "আমার দেরী হওয়াতে এমন কিছু ক্ষতি হয় নি অজিত দা, তোমার এখনও স্নান হয় নি—"

"এই যে আমি এখনই আসছি—"বলিয়া অজিত চলিয়া গেল।

স্নানান্তে আহারে বসিয়া অজিত বলিল, "আজ দাদার পত্র পেলুম গৌরী—"

পত্রে যে কোন অশুভ সংবাদ আছে গৌরী তাহাই বুঝিয়া লইল, ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁরা সবাই ভালো আছেন তো?"

অজিত একটু হাসিয়া বলিল, "তা আছেন।"

গৌরী বলিল, "কিন্তু তোমার মুখটা আজকে বড় ভার মত দেখাচ্ছে অজিত দা, কোন রোগীর কিছু হয়েছে নাকি ?"

অজিত মাথা নাড়িল।

নিঃশব্দে সে ভাত খাইতে খাইতে এক সময় মুখ তুলিল, বলিল, "আমার কপালে আছে নিজে রেঁধে খাওয়া—পরের হাতের রান্না-ভাত খাওয়ার অদৃষ্ট আমার নেই কিনা—"

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে ?"

অজিত বলিল, "মানে আছে যথেষ্ট, সময় হলেই জানতে পারবে।"

সে আর কিছুই বলিল না।

বৈকালে পথে বাহির হইতেই দেখা হইয়া গেল—রামহরি দত্তের সহিত।

অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "হেঁ হেঁ ডাক্তারবাবু আমার নাতিটাকে তো ভালো করে তুললেন —না নিলেন ভিজিট, না নিলেন ওষুধের দাম। গরীব মানুষকে এক দিক দিয়ে বাঁচালেন কিন্তু আর এক দিকে . আমি যে যাই। আমার বড় ছেলেটা বড্ড অসুখে পড়েছে, যদি একবার দেখেন—"

অজিত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমার সময় নেই।"

যে লোকটা মিথ্যাকথা বলিয়া তাহার দাদাকে পত্র দিয়াছে, সেই আজ আবার কোন লজ্জায় যে তাহারই করুণা-প্রত্যাশীরূপে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা অজিত ভাবিয়া পায় না।

দত্ত আগের মতই হাত কচলাইতে কচলাইতে হাসি মুখে বলিল,—"এখন আপনার সময় আছে বই কি, এসময়টায় সময় যথেষ্ট আছে। আপনি একবার চলুন ডাক্তার বাবু,—এই তো বাড়ী, পোয়াখানেক পথও হবে না। একবার তার বুক পিঠ পেটটা কল দিয়ে দেখে আসবেন মাত্র—"

অজিত শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "দেখছো আমার এখন হাজার কাজ, আমি যেতে পারব না। তুমি বরং মাঝের পাড়া হতে আমাদের দীনবন্ধু ভটচাযকে ডেকে নিয়ে যাও, তিনি দেখবেন এখন।"

দত্ত প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে বলিল, "হরি বল, দীনবন্ধু ভশ্চায নাকি ডাক্তার, সে দেখবে রোগী, তা হলেই রোগীর দফা সারা। সে কি দেখতে জানে অজিত বাবু, সে একটী বার হাত দেখলেই—বাস—।"

অজিত বলিল, "কিন্তু তিনিই তো তোমাদের বরাবর দেখে এসেছেন—"

দত্ত সদুঃখে বলিল, "সে দেখা আর এ দেখায় ঢের তফাৎ আছে। তিনি এক হাতে রোগীর নাড়ি খুঁজবেন, আর এক হাত বার করে ভিজিটের দুটাকা নিয়ে বাজাবেন। আর ওষুধপত্র যা দেন—"

বলিতে বলিতে সে এমনভাবে মুখবিকৃত করিল যেন সেইমাত্র সে ঔষধ খাইতেছে।

অজিত ভিজিল না, বলিল, "কিন্তু দুঃখের কথা তোমায়

জানাচ্ছি দত্ত, আমার মোটেই সময় নেই রোগী দেখবার, পরে দেখা যাবে।”

কিন্তু রামহরি দত্তের সত্যই নাকি লজ্জাবোধ নাই তাই সে পথের মাঝখানেই অজিতের পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল, দুই হাতে অজিতের পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, “ওকথা বললে ছাড়ছি নে অজিতবাবু, আপনাকে না রাজি করিয়ে ছাড়ছি নে—এতে আপনি যাই বলুন আর লাথিই মারুন।”

কি বিপদ—

অজিত দেখিতেছিল ইহার দৃঢ় আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হওয়া বড় সহজ কথা নয়। পথের মাঝখানে কেলেঙ্কারী বাড়াইতে তাহার ইচ্ছা ছিল না, সে অগত্যা বলিল, “চল, দেখে আসছি।” রামহরি দত্তের মত লোককে সে ঘৃণা করে, ইহাদের সংস্রবে যাইবার ইচ্ছা তাহার নাই, কিন্তু না যাইয়াও উপায় নাই।

রামহরি দত্তের ছেলেকে দেখিয়া প্রেস্কৃপশন লিখিয়া দিয়া অজিত বাহিরে আসিল। পোষা কুকুরের মত রামহরি দত্ত সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল, অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কাগজটা নিয়ে গেলে আপনার লোক ওষুধ দেবে তো অজিত বাবু?”

অজিত চলিতে চলিতে বলিল, “যখনই যাবে তখনই ওষুধ দেবে,—কিন্তু দামটা নিয়ে যেয়ো দত্ত, আনা বারো লাগবে।”

রামহরি দত্ত যেন আকাশ হইতে পড়িল,—বিস্ফারিত চোখে বলিল—“দাম—দাম লাগবে, আজ আপনি দাম ধরলেন?

কোন দিন যা হয়নি আজ তাই হবে—আপনি বলছেন কি অজিত বাবু ?"

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে অজিত বলিল, "চিরদিন দাতব্য করতে গেলে আমারও তো চলে না দত্ত, আমাকেও তো ঘর হতে পয়সা বার করে তবে ওষুধ কিনতে হয়। বড় লোক শ্বশুরের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, বড় লোক দাদার সঙ্গে যেটুকু ছিল তাও তো তোমার পত্রাঘাতে ঘুচেছে।"

"আমি—আমি,—আপনি বলছেন কি ডাক্তার বাবু—"

রামহরি দত্ত যেন হাঁপাইয়া উঠিল। অজিত বলিল, "যাক গিয়ে সে সব কথা, আসল কথা দামটী নিয়ে যেয়ো, কম্পাউণ্ডারকে বলা আছে—সে পয়সা না নিয়ে ওষুধ দেবে না। শুধু শিশি নিয়ে গিয়ে কেন অপমানিত হবে—দাম নিয়ে যেয়ো।"

সে পিছন দিকে না চাহিয়া হন্ হন্ করিয়া সোজা চলিল।

বারো

গৌরী প্রতিদিন সন্ধ্যায় অজিতের রুটি তরকারী প্রস্তুত করিয়া দিয়া অজিতের ঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া দিত, তাহার পর ঘরে চাবি দিয়া নিতাইয়ের মায়ের কাছে চাবি রাখিয়া দিয়া বাড়ী যাইত।

সেদিনে সন্ধ্যায় ঘরে খাবার রাখিতে গিয়া সে অজিতের বিছানার উপরে অসীতের পত্রখানা দেখিতে পাইল।

পড়িবে না মনে করিয়াও সে এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল—।

গৌরীর মনে হইল, তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে, পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া গিয়াছে, সে একেবারে শূণ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

গৌরী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসিয়া পড়িল,—

ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি যখন ফিরিয়া আসিল তখন মনে পড়িল —এই পত্রখানা পাইয়াই অজিত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। অন্যে যে যাহাই ভাবুক বা বলুক, সব কিছুরই প্রতিবাদ করা চলে, আত্মীয়—বিশেষ বড় ভাইয়ের কথায় প্রতিবাদও করা যায় না, বিবাদও করা যায় না।

বাহির হইতে নিতাই ডাকিল—"দিদি ?

সচকিত হইয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল—"এই যে, আসছি নিতাই —"

নিতাই প্রতিদিন তাহাকে বাড়ীতে দিয়া আসে।

বাহির হইয়া সমস্ত ঘর বন্ধ করিয়া চাবি নিতাইয়ের মায়ের হাতে দিয়া গৌরী নিতাইয়ের সহিত পথে বাহির হইল।

পূর্ণিমার রাত্রি, অম্লান জ্যোৎস্না-ধারায় দিগন্ত ভরিয়া গেছে। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি,—পথের ধারে আমগাছ গুলাতে ছোট ছোট আম ধরিয়াছে।

আকাশ পরিষ্কার—মাঝখানে হাসিতেছে চাঁদ, এ দিক ওদিক দুই চারিটী নক্ষত্র জ্বলিতেছে। সমস্ত দিনের অসহ্য গ্রীষ্মের তাপ সান্ধ্য বাতাসে ছড়াইয়া গিয়াছে, ধরণী তাই এখন অতি শান্ত।

পাশেই কেষ্ট জেলের কুঁড়ে ঘরখানায় মিট মিট করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে,—কেষ্ট চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত উঠানে গ্রীষ্মকালে রাত্রিবাস করিবার জন্য যে মাচা তৈয়ার করিয়াছিল তাহার উপরে আড় হইয়া পড়িয়া গান ধরিয়াছে—

নানা উপসর্গে দিন যায় দুর্গে,
পরিবার বর্গে পরিশোধি ঋণ ;
তারা, দিলে না দিলে না দিন।

পথে লোকের পদশব্দ পাইয়া সে থামিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায় ?"

গৌরী উত্তর দিল, "আমি কেষ্ট—"

"ও—গৌরী মা—"

কেষ্ট আবার গান ধরিল—

গেল না গেল না বিষয় বাসনা
হল না মলিনা পর উপাসনা,
শঙ্করী সর্ব্বানী শিবে, শবাসনা
রটে না রসনা ভ্রমে একদিন
দিলে না দিলে না দিন—(তারা)

গানের প্রতি লাইনটা গৌরীর অন্তরে ধ্বনিত হইয়াছিল—

হল না মলিনা তার উপাসনা—

গৌরীর চোখের জল আসিয়া পড়ে।

তাহার জন্য অজিতও তো বড় কম নির্য্যাতন সয় না, কম কথা শুনে না। অজিত আজি হয় তো তাহাকে বিদায় দেওয়ার কথা বলিত, বলিতে পারে নাই কেবল নিজেই ডাকিয়া লইয়াছে তাই।

না, অজিত হয় তো বলিতে পারিবে না, গৌরীর নিজেরই এখন সরিয়া পড়া উচিত। অজিতের দিন যেমন করিয়াই হউক চলিবে, তাহাতে গৌরী আর ভাবিবে না।

নিজের ঘরের চাবি খুলিয়া প্রবেশ করিয়া সে লণ্ঠন জ্বালিল। ঘরে চারটী মুড়কি চিড়া ছিল, নিতাইয়ের গামছায় ঢালিয়া দিল। কয়েকদিন আগে এককাঁদি কলা কাটাইয়া ঘরে রাখিয়াছিল, কাল হইতে রং ধরিয়াছিল ওবেলা যাইবার সময় লইয়া যাইবার কথা

মনে হয় নাই, গৌরী এখন সেই কলা হইতে কয়েকটা কাটিয়া নিতাইকে দিল, বলিয়া দিল—অজিতকে যেন দেওয়া হয়।

সে নিজে কিছুই আহার করিল না, বিছানাটা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

সে না হয় অজিতদার বাড়ীতে আর যাইবে না। এখানকার লোক তাহাকে যা কিছু ভাবিয়াছে বলিয়াছে, সে সহিয়া গেছে, কিন্তু অসিতও যে অজিতকে সত্যই অসচ্চরিত্র ঠিক করিয়াছে এ অপবাদ সে সহিবে না, অজিতকেও রক্ষা করিবে।

কিন্তু অজিতদার বাড়ীতে না গেলেই বা কি? সে এখানে থাকিতে অজিতের মুক্তি নাই, এমনই অপবাদ নিত্যই তো তাহাকে সহিতে হইবে, নিত্য কথা শুনিতে হইবে।

গৌরী ঠিক করিল সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু কোথায় যাইবে সে? জগতে তাহার আশ্রয় স্থান কোথায়? স্বামীর আলয়ে সে আর যাইবে না, সেখানকার সকলের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া সে চলিয়া আসিয়াছে; নূতন করিয়া আবার সেখানে সম্বন্ধ পাতাইয়া যাইবে না।

ভাবিতে ভাবিতে কখন গৌরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

"গৌরী,—গৌরী—"

মনে হইল কে ডাকিতেছে।

দেড় বৎসর আগেকার একটা রাত্রি সে কি আজই ফিরিয়া আসিয়াছে?

গৌরী ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে।

আজও কি অজিত তাহাকে ডাকিতেছে?

গৌরী কান পাতিয়া রহিল। বাহিরে শোনা যায় বাতাসের সন সন শব্দ, গাছের পাতা নড়িবার সর সর শব্দ। কোথায় একটা পাপিয়া ডাকিতেছে—চোখ গেল চোখ গেল, তাহার শব্দ, মানুষের কোন শব্দই তো পাওয়া যায় না।

গৌরী খোলা জানালা পথে বাহিরের দিকে তাকাইল—শুভ্র জ্যোৎস্না ধারায় চারিদিক ভরিয়া গেছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া গৌরী শুইয়া পড়িল—।

তের

সকাল বেলায় গৌরী সংবাদ পাঠাইল তাহার শরীর খারাপ, আজ সে রাঁধিতে যাইতে অশক্ত।

সত্যই তাহার শরীরটাও খারাপ হইতেছিল, মনে হয় কাল রাত্রে তাহার একটু জ্বর হইয়াছে এবং সে জ্বর এখনও আছে।

ক্লান্তভাবে সে বারাণ্ডায় দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া রহিল। ঘরের কাজ পড়িয়া রহিল, কোন কাজে হাত দিবার ইচ্ছা তাহার হইতেছিল না।

সম্মুখের পথ দিয়া কত লোক আশা যাওয়া করিতে লাগিল; কেহ তাহার পানে তাকাইল, কেহ তাকাইল না।

দাক্ষায়ণী কলসী লইয়া ঘাটে চলিয়াছিলেন। বারাণ্ডায় গৌরীকে তত বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সকৌতুকে ফিরিলেন—বলিলেন, "বলি, কিগো গৌরী, আজ যে বড় কাজ করতে যাসনি—বাড়ীতেই রয়েছিস্ যে?"

গৌরী ডাকিল, "একটা কথা শোন পিসী—দরকার আছে।"

দাক্ষায়ণী কলসীটা নামাইয়া রাখিয়া নিকটে আসিলেন—বলিলেন, "জ্বর হয়েছে নাকি?"

গৌরী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "জ্বরই হয়েছে পিসি, মোটে নড়তে পারছিনে, রাঁধতে যাব কি করে? সেই জন্যে বলছি কি তুমি যদি দয়া করে অজিতদার রান্নার ভারটা নাও, লোকটা খেয়ে বাঁচে, নইলে তোমরা এত লোক থাকতে তাঁকে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।"

দাক্ষায়ণী গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"অবিশ্যি শুকিয়ে মরবে না, একটা না একটা কোন উপায় হয়ে যাবেইখন। আমি রাঁধতে পারব নাই বা কেন? তবে কথা হচ্ছে—দুচার দিনের জন্যে আবার নতুন করে এ সব করতে যেন কেমন কেমন ঠেকে কি না—"

তাঁহার অভিপ্রায় গৌরী স্পষ্ট বুঝিল বলিল, "না না,—দুদিন বাদেই তোমাকে আসতে হবে কেন? আমি অসুখটা সারলেই একজন লোক দিয়ে যেতে চাই সে চিরকাল অজিতদার কাজ করবে - যদি তিনি এখানে থাকেন আর বিয়ে না করেন।"

দাক্ষায়ণী অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন, "কোথায় যাবি তুই আবার,—এখানে থাকার কি হল?"

গৌরী একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার ছেলে বউয়েরা কেউ এখানে থাকতে দিতে চায় না, আমি কেবল জো করেই এখানে পড়ে আছি। এবার তারা জিদ করেছে—ওখানে যেতেই হবে। ভাবছি ওদের চটিয়ে কোন লাভ নেই, সময় অসময়ে ওরাই তো দেখবে। তাদের জানিয়েছি দু' চার দিনের

মধ্যেই আমি যাচ্ছি। সেই জন্যে তোমায় বলছি পিসি, যদি তুমি একাজটা নাও—"

দাক্ষায়ণী অত্যন্ত খুসি হইয়া বলিলেন, "আমার তাতে আপত্তি একটু নেই মা, কবে হতে যেতে হবে— ?"

গৌরী বলিল, "আজই—। আমি তো আজ যেতে পারলুম না অসুখের জন্যে। তুমি স্নানটা করে ওখানে গিয়ে যা হয় দুটো রেঁধে রেখে এসো, তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

এই এখনি আমি যাচ্ছি। অজিতের কাজ আমরা করব না তো করবে কে ? অন্য কেউ হলে হয় তো যেতুম না, কিন্তু অজিতের বেলায় 'না' বলতে পারা যায় না।"

দাক্ষায়ণী ত্বরিতপদে চলিয়া গেলেন।

গৌরী ক্লান্তভাবে ঘরটা পরিষ্কার কবিয়া মেঝের একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

"কখন তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল সে জানে না—। হঠাৎ এক সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অজিতের ডাক শোনা যাইতেছে—"গৌরী—গৌরী –"

স্বপ্ন না সত্য— ?

গৌরী উৎকল হইয়া রহিল।

দরজার কাছে অজিতের ব্যগ্রকণ্ঠস্বর শুনা গেল—"গৌরী—"

গৌরী উঠিতে উঠিতে অজিত মুখ বাড়াইল,—"তোমার অসুখ করেছে, গৌরী ? দেখলুম এ পাড়ার জ্যেঠাইমা রাঁধছেন, জিজ্ঞাসা করে জানলুম তোমার জ্বর। কবে জ্বর হল গৌরী, কিছু বলনি তো ?"

গৌরী একটা আসন দিতে উঠিতেছিল—অজিত বাধা দিল, বলিল, "আসন থাক, আমি তোমার হাতখানা একবার দেখে যাই। "দেখি হাত খানা—"

গৌরী হাত বাড়াইয়া দিল।

অজিত পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "এই তো—বেশ জ্বর রয়েছে। তুমি আজ উঠোনা। চুপ চাপ শুয়ে থাকো। পথ্যের কোন ব্যবস্থা আছে কি?"

গৌরী বলিল, "দেখা যাবে এখন কি হয়।"

অজিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, কি হয় বলে বসে থাকলে চলবে না। আচ্ছা আমি গিয়ে পথ্য তৈরী করে পাঠিয়ে দেব এখন। তুমি এখন আর উঠোনা, চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি সন্ধ্যার দিকে আর একবার বরং এসে দেখে যাব এখন—।"

গৌরী, নিষেধ করিবার আগেই সে বাহির হইয়া গেল।

চৌদ্দ

গৌরী চলিয়া যাইতেছে—

কথাটা অজিতের কানে গিয়া পৌঁছাইতে সে যেন আকাশ হইতে পড়িল।

পাঁচদিন পরে কাল মাত্র সে পথ্য করিয়াছে। আজই চলিয়া যাইবে—কই একথা সে তো বলে নাই।

অজিত গৌরীর নিকটে ছুটিয়া আসিল—"তুমি নাকি চলে যাচ্ছো গৌরী ?"

গৌরী কাপড় গুছাইতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, হ্যাঁ অজিত দা, আমি চলে যাচ্ছি।"

অজিত জিজ্ঞাসা করিল "হঠাৎ চলে যাওয়ার মানে— ?"

গৌরী উত্তর দিল, "অনেক দিন হতেই যাব যাব করছি, যাওয়া আর হয়ে উঠছে না। দেখছি—জোর করে বার হয়ে না পড়লে পরে বেরুনো যাবে না, সেই জন্যে চলছি।"

অজিত মুহূর্তমাত্র নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার স্বামীর উপযুক্ত ছেলেরা—যারা তোমায় একদিন সইতে পারে নি, আজ তারা তোমাকে সংসারে স্থান দেবে কি ?

গৌরী বলিল, "আমি তো সেখানে যাচ্ছিনে অজিত দা। কারও গলগ্রহ হয়ে থেকে ঝাটালাথি খেতে আমি পারব না। সেই জন্যেই তো চলে এসেছি।"

অজিত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "তবে কোথায় যাচ্ছো— ?"

গৌরী বলিল "চলেছি নবদ্বীপে। আমার সম্পর্কে ননদ একটী মেয়ে ওখানে থাকেন, তাঁকে পত্র লিখেছিলুম, তিনি যেতে বলেছেন তাই যাচ্ছি।"

একটু হাসিয়া পরমুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া সে বলিল, "আমার কাছে সবই সমান, এখানেও যা, নবদ্বীপে থাকলেও তাই, শালগ্রাম শিলার শোওয়া বসা সমান।"

অজিত গম্ভীর মুখে বলিল, "জানি তোমার শালগ্রামের শোওয়া বসার ব্যাপার। কিন্তু শালগ্রামের ক্ষুধা তৃষ্ণা বা লজ্জা নিবারণের ভাবনা নেই—তোমার তা আছে গৌরী।"

গৌরী অতি সংক্ষেপে উত্তর দিল, "জুটে যাবে, ভগবানের রাজ্যে কেউ অনাহারে থাকে না, আর সভ্য-সমাজে কেউ যে কাপড়ের অভাবে থাকবে তাও হয় না, কেউ না কেউ একখানা ছেঁড়া কাপড়ও ফেলে দেয়।"

অজিত শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "ওইখানেই ভুল করছো গৌরী। তা যদি হতো—ভগবানের রাজত্বে লোকে খেতে পরতে পেত—তা হলে অনেক লোকই অন্ন বস্ত্রের জ্বালায় আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়াত না। আসল কথা কি জানো,—তেলা মাথায় সবাই তেল

দেয়, রুক্ষ মাথায় বেশী তেলের দরকার হয় বলে কেউ ঢালতে চায় না। ভগবানের সৃষ্ট জীব মানুষ,—কিন্তু সব এক চোখো—যেমন মানুষ—তেমনি ভগবান। এ জগতে, মানুষ মানুষকে ছিঁড়ে খায় তা জানো?"

গৌরী উত্তর দিল, "জানি,—"

অজিত বলিল, "তবু সেই মানুষেরই দয়ার প্রত্যাশী হয় মানুষ, এতটুকুর জন্যে হাত পাতে। ভগবান কি করবেন—তিনি তো সৃষ্টি করেই খালাস—তোমার ভার তোমার নিজেরই পরে, তুমি পথ বেছে নাও,—পরিশ্রম কর, খাট খাও; এর বেশী আরও প্রত্যাশা ভগবানের কাছেও চলে না।"

গৌরী খানিকক্ষণ নীরবে রহিল, তাহার পর বলিল, "সব জানি অজিত দা, কিন্তু এ রকম করে বাঁধা পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে অন্যত্র সরে যাওয়া ভালো। বলবে, অভাবে পড়ে আত্মহত্যা আছে হয় তো অদৃষ্টে—হয় তো আছে,—কিন্তু অত সহজে নয়। আর একটা কথাও বলি, এখানেই বা আমি এমন কি প্রাচুর্য্যের মধ্যে আছি? প্রতি মাসে ঝগড়া করে মারামারি করে পাঁচটী করে টাকা আদায় করা—সেও তো বড় কম কেলেঙ্কারীর ব্যাপার নয়।"

অজিত চুপ করিয়া রহিল, গৌরীও আর কথা না বলিয়া ক্ষিপ্র-হস্তে কাপড় গুলা ভাঁজ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে অজিত মুখ তুলিল—

"আমি জানি গৌরী, তুমি কেন যেতে চাচ্ছো, অন্য কথা বলে

চাপা দিয়ে যেতে পারবে না, সে সত্যকথা আমি জানতে পেরেছি।'

গৌরী অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কি জানতে পেরেছো অজিত দা—

অজিত বলিল, "একদিন দাদা আমাকে একখানা পত্র দিয়েছিলেন, সেই পত্রখানা কোন রকমে তুমি পড়েছিলে। আমি বুঝেছি সেই পত্র পড়ে তোমার মনে ঘা লেগেছে, তাই তুমি এখান হতে চলে যাচ্ছো।"

গৌরী একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, একটু হাসিয়া বলিল, "সত্যিই তাই অজিত দা, মিছেমিছি আমার জন্যে তুমি যে সকলের কাছ হতে শ্রদ্ধা ভালোবাসা হারাবে সে আমি সইতে পারব না ; সেই জন্যে আমি চলে যাচ্ছি।'

অজিত বলিল, "কেবল এরই জন্যে তোমার চলে যাওয়া উচিত নয়, দাদাকে সব বুঝিয়ে পত্র দিয়েছি, দাদা মূর্খ নন, তিনি নিজের ভুল বুঝবেন। আর আমায় কে কি বললে জেনে তুমিই বা চলে যাবে কেন গৌরী, আমার জন্যে তুমি কেন এভাবে কষ্ট সইবে ? তোমার চলে যাওয়ার চেয়ে বরং আমার যাওয়া ভালো, আমার আশ্রয় আছে, দাদা আমায় বার বার ডাকছেন। আর অন্যের আশ্রয় না থাকলেও আমি যে কোন জায়গায় নিজের স্থান করে নিতে পারব কারণ আমি পুরুষ। তুমি পারবে না গৌরী,— তুমি মেয়ে, বয়স অল্প, পথে তোমার আশ্রয় মিলবে না। আমার

জন্যেই যদি তুমি এ ঘর ছাড়তে চাও, আমি তোমায় অনুরোধ করছি—তুমি ছেড়ো না।"

গৌরী শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমার চেয়ে তোমার মূল্য বেশী অজিত দা—আমি গেলে কারও কোন ক্ষতি হবে না, তুমি গেলে দেশের কতটা ক্ষতি হবে তা হয়তো তুমি ভাবো নি। এ দেশের নয়—প্রত্যেক দেশেরই লোকের প্রকৃতি—সময় ও সুযোগ পেলে তারা উপকারীরই সর্ব্বনাশ করতে চাইবে, আবার অসময়ে পড়লে তারই পায়ে আছড়ে পড়বে। এরা করুণার পাত্র অজিত দা, তাই এদের পরে রাগ করা চলে না। সামান্য একটা মেয়ের জন্যে তুমি তোমার মহৎ আদর্শ হারিয়ে ফেলো না। এই এই সব হতভাগাদের মানুষ করার চেষ্টা কর এদের গড়ে তোল। এ কাজ আমার নয় অজিত দা, এ কাজ তোমার, তুমিই করো। আমি এখানে থাকলে তুমি বাধা পাবে, আমায় চলে যেতে দাও, আমিও বাঁচব—তুমিও বাঁচবে।"

নত হইয়া সে অজিতের পায়ের ধূলা মাথায় দিল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে শুধু আশীর্ব্বাদ কোর—আমি যেন অভাবে পড়ে লক্ষ্য না হারাই, আমার সংকল্প যেন অটুট থাকে।" অজিত কেবল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

পনর

গৌরী চলিয়া গেল।

কাকিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, "মেয়েটা থাকলে অবরে সবরে তবু কাজে লাগতো।"

কাকা বলিলেন, "কিন্তু হিসেব কোর, মাসে পাঁচ টাকা হিসেবে বছরে ষাট টাকা সে আদায় করতো। যাওয়ার সময় সব স্বত্ব সে ছেড়ে দিয়ে গেল এইটাই আমার পরম লাভ।"

গৌরীকে বিদায় দিয়া অজিত নিজের গৃহে ফিরিল।

দাক্ষায়ণী নিজের সংসার তুলিয়া দিয়া অজিতের সংসারেই আসিয়া উঠিয়াছেন। নিজের বলিতে দুনিয়ায় কেহ নাই,—অজিতই তাঁহাকে নিজের বাড়ী আনিয়াছে।

তিনি সদুঃখে বলিলেন, "আহা, মেয়েটা বড় ভালো ছিল বাছা, দুনিয়ার লোকের উপকার করে বেড়াতো, এতটুকু "ঘেন্না পিত্তি" ছিল না। সেই সব লোকেরাই এমন করে লাগলো যে এক দিন সে আর গাঁয়ে তিষ্ঠাতে পারলে না। এখন সেই নবদ্বীপ সহর, —একা ওই মেয়ে কি করে যে চলবে কে জানে?"

নিতাইয়ের মা গৌরীর সঙ্গে গিয়াছে, নিতাইয়ের মনে অহঙ্কার

আছে তাহার মা যখন সঙ্গে আছে—কোন ভয় নাই। সে দাক্ষায়ণীকে সান্ত্বনা দিল, "মা আছে সঙ্গে, ঠিক নিয়ে যাবে এখন—দেখা শোনাও করবে।"

অজিত কোন কথায় কান দেয় নাই, নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল।

মনটা মোটেই ভালো ছিল না।

তাহারই জন্য—তাহাকে সকলের কাছে বড় করিয়া রাখিবার জন্য এই যে মেয়েটী সব ছাড়িয়া পথে বাহির হইল-ইহার জন্য সত্যই সে দারুণ কষ্ট পাইয়াছিল।

কেন—লোকে তাহাকে যাহাই বলুক না. গৌরীর তাহাতে কি? কেন গৌরী তাহার জন্য সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে?

বিদ্যুতের মত একটা কথা অজিতের মনে জাগিয়া উঠিল—

গৌরী তাহাকে ভালোবাসে।

আজ একে একে সেই ছোট বেলা হইতে এ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা অজিতের মনে পড়িতেছিল।

নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া গৌরী তাহাকে বাঁচাইয়াছে, গ্রামের লোকের উপহাস নিন্দা তুচ্ছ করিয়া সে অজিতের আহ্বানে চলিয়া আসিয়াছে, অজিতের কাজ করিয়াছে।

অজিত চমকাইয়া উঠিল—

তাহার মনে গৌরী অনেকখানি ছাপ দিয়া গিয়াছে।

"সুলতা—সুলতা—"